UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BENGALI **CODE:19**

UNIT- 8: রবীন্দ্র সাহিত্য

Sub Unit – 1:

১.১ চিত্রা (কাব্য)
১.২ পুনশ্চ (কাব্য)
১.৩ নবজাতক (কাব্য)

Sub Unit – 2:

২.১ ঘরে বাইরে (উপন্যাস)
২.২ চতুরঙ্গ (উপন্যাস)

Sub Unit – 3:

৩.১ নিশীথে, দুরাশা, স্ত্রীর পত্র, হৈমন্তী, ল্যাবরেটরি (ছোটোগল্প)

Sub Unit – 4:

৪.১ অচলায়তন (নাটক)
৪.২ মুক্তধারা (নাটক)

Sub Unit – 5:

৫.১ মেঘদূত (প্রবন্ধ)
৫.২ ছেলেভুলানো ছড়া - ১ (প্রবন্ধ)
৫.৩ বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ)
৫.৪ সাহিত্যের তাৎপর্য (প্রবন্ধ)
৫.৫ তথ্য ও সত্য (প্রবন্ধ)
৫.৬ বাস্তব (প্রবন্ধ)
৫.৭ সাহিত্যে নবত্ব (প্রবন্ধ)
৫.৮ আধুনিক কাব্য (প্রবন্ধ)
৫.৯ মনুষ্য (প্রবন্ধ)
৫.১০ নরনারী (প্রবন্ধ)
৫.১১ পল্লীপ্রকৃতি -১ (প্রবন্ধ)

Sub Unit – 6:

৬.১ জাপানযাত্রী

Sub Unit – 7:

৭.১ জীবনস্মৃতি

Teachinns Text with Technology

Sub Unit - 1
চিত্রা

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বভূমির কবি। তিনি মনে - প্রানে চিন্তায় - কর্মে দু:খে-সুখে জীবনে - মরনে সমান দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে নিয়ে ভেবেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারায় তিনি অনন্য বিশিষ্টতা ও সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ পঁয়তাল্লিশটির বেশি কাব্যরচনা করেছেন। এই কাব্যরচনার ক্রমবিকাশের পথে একটি বিশেষ যুগ হল 'চিত্রা'র যুগ। যা আমাদের আলোচ্য বিষয়।

'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের ঠিক চার বছর পর কাব্যে রবীন্দ্র প্রতিভার বিশেষ বিচ্ছুরন এল সেই বিশেষ প্রতিভার উন্মেষ ও যুগ। তিনটি শ্রেষ্ট কাব্যগ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করল - 'চিত্রা' (১৮৯৩) 'মানসী' (১৮৯০) ও 'সোনার তরী' (১৮৯৩)। কাব্যে সৌন্দর্য ব্যাকুলতা ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্য বোধের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, এবং রহস্যময় আবেদন 'চিত্রা' কাব্যে এসে একটা পূর্ণতা ও বিরাম লাভ করেছে। 'চিত্রা' কাব্যে রূপের সঙ্গে অরূপভাবুকতার মিশ্রন ঘটেছে। 'চিত্রা'তেই প্রথম বোঝা যায় কবির ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিনতির মুখে ধাবমান।

মানস সুন্দরীর অপার্থিব প্রেমের টানে কবি নিরুদ্দেশ যাত্রায় ('সোনার তরী') বাহির হলেও কবি সেই রহস্যময়ীর আবরণ উন্মোচনে সক্ষম হননি। কিন্তু 'চিত্রা' কাব্যে তার স্বরূপ উন্মোচনে স্পষ্টত সক্ষম হয়েছেন। 'সোনার তরী'র সেই বিমূর্ত (Abstract) নারীমূর্তি 'চিত্রা'য় এসে কবিকে 'জীবন দেবতা' রূপে ধরা দিয়েছে। এই জীবন দেবতা আমাদের ধর্মশাস্ত্রের ঈশ্বর নন। এ বিষয়ে বিশিষ্ট সমালোচক বলছেন ---

''চিত্রার পর্যায়ে একটি সর্বোতোমুখী পূর্ণতাবোধ থেকেই 'জীবনদেবতা' শ্রেণীর কাব্যের উৎপত্তি । জীবনদেবতা - দর্শন গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে কবির আত্ম - স্বরূপ আবিষ্কার''।

[রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়:- ড: ক্ষুদিরাম দাস]

অর্থাৎ এই জীবনদেবতা কবি সৃষ্ট একান্তভাবেই তাঁর অধিদেবতা। কবি উপলব্ধি করেছেন তাঁর কবিতা এমন শিল্পগুনান্বিত হয়ে ওঠে যে যা তার পরিমিত শক্তিতে ও সচেতন প্রয়াসে এই অসাধ্যসাধন সম্ভব নয়। কোনো এক 'অন্তর্যামী ' তাঁকে দিয়ে এই অসাধ্যসাধন করিয়ে নেয়। কবি এই 'অন্তর্যামী কেই 'জীবনদেবতা' নামে অভিহিত করেছেন। 'সোনার তরী'র মানসসুন্দরী 'চিত্রা' কাব্যে জাগতিক উপলব্ধিতে বিচিত্র রূপিনী রূপে ধরা দিয়েছেন। কবির অর্ন্তমুখী উপলব্ধিতে হয়ে উঠেছেন তিনিই 'জীবনদেবতা'।

'চিত্রা' কাব্যের কবিতাগুলি ১৩০০ থেকে ফাল্গুন ১৩০২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত দুই সময় কালের মধ্যে রচিত। অধিকাংশ কবিতায় লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপারে , পতিসর - শিলাইদহ , রামপুর ও জোড়া সাঁকোতে। একমাত্র 'সুখ' কবিতাটি এই সময়কালের পূর্বে ১৩ চৈত্র, ১২৯৯ বঙ্গব্দে রচিত। কবিতাটি প্রথমে ''সোনার তরী' (১৮৯৩) কাব্যে প্রকাশিত হয়। পরে 'চিত্রা' কাব্যে সংগৃহীত হয়েছে। প্রথম প্রকাশ কালে কবিতার সংখ্যা হল পঁয়ত্রিশ (৩৫)। পরে সংস্করণ করে কাব্যগ্রন্থাবলী রূপে যখন প্রকাশ হল তখন কবিতা সংখ্যা দাঁড়াল সাতচল্লিশ টি।

তবে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'চিত্রা' স্বতন্ত্র কাব্য রূপে প্রথম প্রকাশে ৩৫ টি কবিতাকে সম্বল করেই প্রকাশিত হয় পরে কাব্যগ্রন্থবলী সংস্করণে গৃহীত চারটি কবিতা 'স্নেহস্মৃতি' 'নববর্ষে', 'দুঃসময়' ও 'ব্যাঘাত যুক্ত হয়। কিন্তু 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য' ও 'দুইবিঘা জমি' নামাঙ্কিত তিনটি কবিতা বর্জিত হয় ।রচনাবলী সংস্করনে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় (৩৫+৪-৩) = ৩৬টি। বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ সংস্করনে বর্জিত কবিতা তিনটি পুনরায় গৃহীত হয়ে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৯ টি। চিত্রা কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (৪র্থ খন্ডে) পাঁচটি গুচ্ছে সাজিয়েছেন।

কাহিনী

(১) এই পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত কবিতাগুলি হল 'ব্রাহ্মণ', 'পুরাতন ভৃত্য' ও দুই বিঘা জমি '--

চিত্রা

এই গুচ্ছের কবিতাগুলিতে কবিহৃদয়ের প্রশান্তি প্রেম ও সৌন্দর্য কল্পনা জীব ও জড় প্রকৃতির সঙ্গে একসাথে মিলেছে। 'সুখ''জ্যোৎস্নারাত্রে ''প্রেমের অভিষেক ' , 'সন্ধ্যা', 'পূর্ণিমা' 'উর্বশী , 'সান্ত্বনা', 'দিনশেষে' 'বিজয়ানী' 'প্রস্তরমূর্তি' 'নারীর

দান’ ‘রাত্রে ও প্রভাতে’ ‘প্রৌঢ়’ ও ‘ধূলি’।

স্বীকৃতি

গুচ্ছে পড়ে ‘এবার ফিরাও মোরে’ ‘মৃত্যুর পরে’, ‘সাধনা’, ‘শীতে ও বসন্তে’, ‘নগর সঙ্গীত’ ‘স্বর্গ হইতে বিদায়’ ‘গৃহশত্রু’, ‘মরীচিকা’ ‘১৪০০ সাল’ ও ‘দূরাকাঙ্ক্ষা’।

অর্ন্তযামী

গুচ্ছে পড়ে ‘চিত্রা’, ‘অর্ন্তযামী’ ‘উৎসব’ ।

জীবনদেবতা

গুচ্ছে পড়ে ‘আবেদন’ ‘শেষ উপহার’ ‘জীবনদেবতা’ ‘নীরব তন্ত্রী ও ‘সিন্ধুপারে’।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও মন্তব্য

১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘চিত্রা’ কাব্যের প্রকাশ কাল ১১ মার্চ ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দ (২৯ শে ফাল্গুন -১৩০২ বঙ্গাব্দ)।

২) চিত্রা গ্রন্থটি কাউকে উৎসর্গ করা হয়নি।

৩) ‘চিত্রা’ কাব্যের অন্তর্গত ‘সুখ’ কবিতাটি প্রথমে ‘সোনার তরী’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হয় । পরে ‘চিত্রা’ কাব্যে গৃহীত হয়। ‘সুখ’ কবিতাটি নিয়েই ‘চিত্রা’ কাব্যের কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫।

৪) ‘‘কাব্যকলার ক্রমবিকাশের পথে চিত্রা হল সেই উচ্চভূমি যেখানে সমস্ত পথ, একটা স্থিরত্ব ও সংহতি লাভ করেছে , যেখানে উচ্চতা পূর্ণতা ও বিরাম, এবং যেখান থেকে দেখা যায় যে পথ বহুদূরে অনন্তে গিয়ে মিশেছে। চিত্রাতেই সর্বপ্রথম বোঝা গেল যে কবির ব্যক্তিত্ব গতিশীল এবং একটা পরিনতির মুখে ধাবমান’’। (ক্ষুদিরাম দাস। রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়)

৫) ‘জগতে বিচিত্ররূপিণী আর অন্তরে একাকিনী কবির কাছে এ দুই-ই সত্য, আকাশ এবং ভূতলকে নিয়ে ধরণী যেমন সত্য। এই দুই সত্য একত্র হয়েছে চিত্রা কাব্যে। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৬) ‘‘চিত্রাতে কবির প্রতিভা ও ব্যাক্তিত্ব বৃক্ষ -- জীবনের মত দুইদিকে প্রসার লাভ করিতেছে একদিকে তাহা আপন ব্যাক্তিত্বের নব নব দ্বার উন্মোচন করিতেছে, অপরদিকে বিশ্বকে নানা দিক হইতে সমাজ, রাজনীতি, সৌন্দর্যতত্ত্ব -- নানাভাবে আয়ত্ত করিতে চাহিতেছে’’। (প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ)

৭) ‘‘ধর্মশাস্ত্রে যাঁহাকে ঈশ্বর বলে তিনি বিশ্ব লোকের আমি তাঁহার কথা বলি নাই; তিনি বিশেষ রূপে আমার, অনাদি অনন্তকাল একমাত্র আমার, আমার সমস্ত জগৎ সংসারে সম্পূর্ণরূপে যাঁহার দ্বারা আচ্ছন্ন, যিনি আমার অন্তরে এবং যঁহার অন্তরে আমি, যাহাকে ছাড়া আমি কাহাকেও ভালোবাসিতে পারি না, যিনি ছাড়া আর কেহ এবং কিছুই আমাকে আনন্দ দিতে পারে না। চিত্রা কাব্যে তাঁহারই কথা আছে। (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ)

৮) ‘‘সমস্ত ভালোবাসা সমস্ত সৌন্দর্য আমি যাঁহাকে খন্ড খন্ড ভাবে স্পর্শ করিতেছি যিনি বাহিরে নানা এবং অন্তরে এক , যিনি ব্যাপ্তভাবে সুখদুঃখ অশ্রুহাসি এবং গভীরভাবে আনন্দ, চিত্রা গ্রন্থে আমি তাঁহাকেই বিচিত্রভাবে বন্দনা ও বর্ণনা করিয়াছি’’। (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পাত্রের অংশবিশেষ)

৯) ‘‘যে অমূর্ত নিরাকার ভাবময় সৌন্দর্য সমস্ত আকারের মধ্যে , মূর্তির মধ্যে, বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত -প্রতিভাত প্রতিস্ফূর্ত হইতেছেন তাঁহারই বন্দনা এই চিত্রা কবিতা ’’--- (চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় --রবিরশ্মী)

১০) গ্রন্থাগারে প্রকাশের পূর্বে ‘চিত্রা’ কাব্যের ১৫ টি কবিতার মধ্যে সাধনাতেই প্রকাশিত হয় ১৪ টি । একটিমাত্র কবিতা ‘স্নেহস্মৃতি ভারতী ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ।

১. ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত ও বর্জিত সমস্ত কবিতার নাম, রচনাকাল, ও রচনাস্থান পত্রিকায় প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশকাল প্রকাশস্থান দেওয়া হল-

ক্রমিক	কবিতারনাম	রচনাকাল	রচনাস্থান	পত্রিকায় প্রকাশ	পত্রিকায় প্রকাশ কাল
১.	চিত্রা	১৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২	সাজাদপুর (?)	---	---
২.	সুখ	১৩ চৈত্র, ১২৯৯	রামপুর বোয়ালিয়া	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক ১৩০০
৩.	জ্যোৎস্না রাত্রে	রাত্রি, ৫-৬ মাঘ ১৩০০	---	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২
৪.	প্রেমের অভিষেক	১৪ মাঘ, ১৩০০	জোড়াসাঁকো	সাধনা	ফাল্গুন, ১৩০০
৫.	সন্ধ্যা	৯ ফাল্গুন, সন্ধ্যা ১৩০০	পতিসর	সাধনা	মাঘ ১৩০০
৬.	এবার ফিরাও মোরে	২৩ ফাল্গুন ১৩০০	রামপুর বোয়ালিয়া	সাধনা	চৈত্র, ১৩০০
৭.	স্নেহস্মৃতি	বর্ষশেষ ১৩০০	জোড়াসাঁকো	ভারতী	কার্তিক, ১৩০২
৮.	নববর্ষে	নববর্ষ ১৩০১	জোড়াসাঁকো	সাধনা	বৈশাখ, ১৩০১
৯.	দুঃসময়	৫ বৈশাখ ১৩০১	জোড়াসাঁকো	----	----
১০.	মৃত্যুরপরে	৫ বৈশাখ ১৩০১	জোড়াসাঁকো	সাধনা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২
১১.	ব্যাঘাত	জ্যৈষ্ঠ ১৩০২	জোড়াসাঁকো	----	----
১২.	অন্তর্যামী	ভাদ্র ১৩০১	শিলাইদহ	সাধনা	আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০০
১৩.	সাধনা	৪ কার্তিক ১৩০১	শান্তিনিকেতন	সাধনা	অগ্রহায়ণ, ১৩০১
১৪.	শীতে ও বসন্তে	১৮ আষাঢ় ১৩০২	সাজাদপুরের কুঠিবাড়ি	সাধনা	শ্রাবণ, ১৩০২
১৫.	নগরসংগীত	---	---	সাধনা	ভাদ্র-কার্তিক, ১৩০২
১৬.	পূর্ণিমা	১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩০২	শিলাইদহ (বোটেরমধ্যে)	---	---
১৭.	আবেদন	২২অগ্রহায়ণ ১৩০২	জলপথে (শিলাইদহঅভিমুখে)	---	---
১৮.	উর্বশী	২৩ অগ্রহায়ণ ১৩০২	জলপথে (শিলাইদহঅভিমুখে)	---	---
১৯.	স্বর্গহইতে বিদায়	২৪ অগ্রহায়ণ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---

২০.	দিনশেষে	২৮ অগ্রহায়ণ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---
২১.	সান্ত্বনা	২৯ অগ্রহায়ণ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---
২২.	শেষ উপহার	১ পৌষ ১৩০২	শিলাইদহ	---	---
২৩.	বিজয়িনী	১ মাঘ ১৩০২	---	---	---
২৪.	গৃহ-শত্রু	১৫ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
২৫.	মরীচিকা	১৬ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
২৬.	উৎসব	২২ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো	---	---
২৭.	প্রস্তরমূর্তি	২৪ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
২৮.	নারীরদান	২৫ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
২৯.	জীবনদেবতা	২৯ মাঘ ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
৩০.	রাত্রে ও প্রভাতে	১ ফাল্গুন ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
৩১.	১৪০০ সাল	২ ফাল্গুন ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
৩২.	নীরব তন্ত্রী	৪ ফাল্গুন ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
৩৩.	দুরাকাঙ্ক্ষা	৪ ফাল্গুন ১৩০২	জোড়াসাঁকো (?)	---	---
৩৪.	প্রৌঢ়	৭ ফাল্গুন ১৩০২	কলকাতা	---	---
৩৫.	ধূলি	১৫ ফাল্গুন ১৩০২	কলকাতা	---	---
৩৬.	সিন্ধুপারে	২০ ফাল্গুন ১৩০২	জোড়াসাঁকো	---	---
৩৭.	বিকাশ	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৩৮.	বিস্ময়	১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৩৯.	বন্দনা	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৪০.	মনেরকথা	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৪১.	আত্মোৎসর্গ	১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১	---	---	---
৪২.	অতিথি	১২ আশ্বিন, ১৩০২	---	---	---
৪৩.	দুই বিঘা জমি	৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২	---	সাধনা	আষাঢ়, ১৩০২
৪৪.	পুরাতন ভৃত্য	১২ ফাল্গুন, ১৩০১	শিলাইদহ	সাধনা	চৈত্র, ১৩০১
৪৫.	ব্রাহ্মন	৭ ফাল্গুন, ১৩০১	শিলাইদহ	---	ফাল্গুন, ১৩০১

teachinns Text With Technology

৪৬.	নবজীবন	১৩ আশ্বিন, ১৩০২	---	---	---
৪৭.	মানবসন্ত	১৪ আশ্বিন, ১৩০২	---	---	---
৪৮.	ভগ্ন	২৬ ভাদ্র, ১৩০২	---	---	---

১.২ পুনশ্চ (১৯৩২) :

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে 'পুনশ্চ' (১৯৩২) ভিন্ন ধরনের কাব্যগ্রন্থ । 'পুনশ্চ' এই নামকরনের মধ্যে একটা আলাদা অর্থের ইঙ্গিত আছে তা হল পুনরায় নতুন করে আরম্ভ করা 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের পর 'পুনশ্চ'র আত্মপ্রকাশ । 'পরিশেষ' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যজীবনের ইতি ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন । ভেবেছিলেন কবিকর্ম থেকে অবসর নেবেন ।নৈরাশ্য ও হতাশা গ্রাস করেছিল এ সময় কবিকে, কিন্তু সেই নৈরাশ্যের কূলে দঁড়িয়েই কবি আবিষ্কার করেছিলেন নিজেকে, কবি যদিও খ্যাতি অখ্যাতির প্রশ্ন তুলেছেন , পুরাতন দিনের এবং নূতন দিনের কবিমানসের মধ্যে একটা সেতু সথাপন করে, নতুন পালা শুরু করেছেন । এই নতুন পালার কাব্যের নাম হল 'পুনশ্চ' । এই কাব্যের 'নতুন কাল' কবিতায় কৈফিয়ৎ দিয়ে লিখেছেন, ।। ''তাই ফিরে আসতে হল' আর একবার ।

দিনের শেষে নতুন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে, ভালোবাসার
দোহাই মেনে''। ।।

একেবারে নতুন কালের ভাবনাকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করলেন ।

জন্ম রোমান্টিক কবি রবীন্দ্রনাথ কল্পনাবিলাসের জাল ছিন্ন করে একদা 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় মর্ত্যমানবের কাছে ফিরতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা ছিল ক্ষনিকের আবেদন, রবীন্দ্রনাথের দুঃখবিলাস মাত্র, কিন্তু পুনশ্চ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের আনন্দ বেদনাকে কাব্যের বিষয়ীভূত করতে চেয়েছেন। এখানে সাধারনের মধ্যে অসাধারণকে দেখার আগ্রহ মানুষকে অতিক্রম করে ইতর প্রাণী, কীটপতঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তিনি দেশব্যাপী অস্পৃশ্যতা দূরীকরনের তীব্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মানব প্রেমের মন্ত্র নিয়ে মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন এই কাব্যে।

যারা এতদিন ছিল বঞ্চিত, অবহেলিত তারাই তাঁর কবিতার কেন্দ্রে এসে দাঁড়াল। সমাজের অবহেলিত নরীদের বেদনাকে ভাষা দিলেন 'সাধারণ মেয়ে' র প্রেমে, 'বাঁশি' কবিতায়। 'ক্যামেলিয়া' র সাঁওতাল রমণী, মা- মরা 'ছেলেটা' কবির দরদী সহানুভূতিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'প্রথমপূজা' 'স্নান সমাপন' 'প্রেমের সোনা' 'শিশুতীর্থ' ইত্যাদি কবিতার মধ্য দিয়ে মানবতার জয় ঘোষণা করলেন। জাতি ধর্ম -বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে তিনি মহত্ত্বে উন্নীত করেছেন।

সর্বোপরি 'পুনশ্চ' সবার আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার আঙ্গিক চেতনায় । রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার প্রথম প্রয়াসের পরিচয় আছে 'লিপিকা'র প্রথম অংশে। পুনশ্চে তিনি সার্থক ভাবেই গদ্য কবিতার জন্ম দিলেন । এ বিষয়ে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ।----

''পুনশ্চের গদ্য কবিতা গুলিতে রেখার যে সূক্ষ্মতা ও ভাবের যে বলিষ্ঠতা প্রস্ফুটিত তাহা পদ্য কবিতায় হইলে ছন্দের তরঙ্গে ও বাচনের বর্ণচ্ছত্রাবলীতে নিশ্চয়ই অনেকটা খর্ব ও শ্লথ হইয়া পড়িত।''

[বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খন্ড ডঃ সুকুমার সেন]

পদ্যের বৃত্তবন্ধন ও অন্ত্যমিল পরিত্যাগ করে গদ্যের মধ্যে কবিতার স্বাদ সঞ্চার করলেন । ফলে কবিতা হয়ে উঠল গদ্য কবিতা। 'পুনশ্চ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম গদ্য কবিতার সংকলন । কাব্যটি আশ্বিন ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশকালে কবিতা সংখ্যা ছিল ৩৭ টি । প্রথম সংস্করন প্রকাশিত হয় ফাল্গুন , ১৩৪০ । এই সংস্করণে পূর্ববর্তী 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের ছয়টি কবিতা ----

১. খেলনার মুক্তি ২. পত্রলেখা ৩. খ্যাতি ৪. বাঁশি ৫. উন্নতি ৬. ভীরু এবং সাতটি নতুন কবিতা ১. তীর্থযাত্রী ২. চিরকালের বাণী ৩. শুচি ৪. রঙরেজিনি ৫. মুক্তি ৬. প্রেমের সোনা ও 'স্নান সমাপন' সব মিলিয়ে মোট তেরটি (১৩) কবিতা যুক্ত হয় । অর্থাৎ প্রথম সংস্করনে পুনশ্চের কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ টি । এই ৫০ টি কবিতার মধ্যে ১৮টি কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ।

- রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্যকবিতা সংকলন 'পুনশ্চ' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় আশ্বিন, ১৩৩৯ বঙ্গব্দে (১৯৩২) খ্রিষ্টাব্দে ।
- প্রকাশক জগদানন্দ রায় । বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত । মুদ্রন সংখ্যা ১১০০
- 'পুনশ্চ' কাব্যের প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই ।
- 'পুনশ্চ' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠা কন্যা মীরা ও নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র নীতিন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ওরফে 'নীতু' কে উৎসর্গ করেন ।

- প্রথম প্রকাশকালে কবিতা সংখ্যা ছিল ৩৭ টি ।
- দ্বিতীয় সংস্করণে ‘পরিশেষ’ কাব্যগ্রন্থের ছয়টি কবিতা এবং নতুন লেখা ৭টি কবিতা মোট ১৩টি কবিতা যুক্ত হয়ে কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০ টি।
- ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ৫০ টি কবিতার মধ্যে ১৮ টি কবিতা গ্রন্থভুক্তির পূর্বেই বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ।
- ‘শিশুতীর্থ’ কবিতাটি পত্রিকায় প্রকাশকালে নাম ছিল ‘সনাতনম’ - এনম আহুর্ উতাদ্য স্যাৎ পুনর্নবঃ; যার অর্থ - -- ইনিই সনাতন, ইনিই অদ্য পুনর্নব ।
- ‘পুনশ্চ’ কাব্যের শিশুতীর্থ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই লেখা (ঞ্চঝবন ইবভরধঞ্চ) নামক রচনা নিজকৃত বঙ্গানুবাদ।
- ‘সঞ্চয়িতা’ গ্রন্থে ‘পুনশ্চ’ কাব্যের ৭ টি কবিতা গৃহীত হয়েছে ।---- ১) পুকুর ধারে ২) ক্যামেলিয়া ৩) ছেলেটা ৪) সাধারন মেয়ে ৫) খোয়াই ৬) শেষ চিঠি এবং ৭) ছুটির আয়োজন
- রবীন্দ্রনাথের ‘পুনশ্চ’ কাব্যের মোট ৫০ টি কবিতার মধ্যে শান্তিনিকেতনে বসে লিখেছেন ৪৭ টি কবিতা , কলকাতায় একটি ‘চিররূপের বাণী’ এবং বরানগরে বসে লেখেন দুটি --- ‘রঙরেজিনি’ ও ‘স্নান সমাপন’।

‘পুনশ্চ’ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত সমস্ত কবিতার নাম, রচনাকাল, ও রচনাস্থান পত্রিকায় প্রকাশকাল, দেওয়া হল ---

ক্রমিক	কবিতার নাম	রচনাকাল	রচনাস্থান	পত্রিকায় প্রকাশ	পত্রিকায় প্রকাশকাল
১.	কোপাই	১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
২.	নাটক	৯ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৩.	নূতনকাল	১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৪.	খোয়াই	৩০ শ্রবন, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৫.	পত্র	১০ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৬.	পুকুর-ধারে	২৫ বৈশাখ, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	বিচিত্রা	আশ্বিন, ১৩৩৯
৭.	অপরাধী	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৮.	ফাঁক	১১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৯.	বাসা	৩ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১০.	দেখা	৪ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১১.	সুন্দর	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১২.	শেষ দান	৫ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১৩.	কোমলগান্ধার	১৩ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১৪.	বিচ্ছেদ	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১৫.	স্মৃতি	৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---

১৬.	ছেলেটা	২৮ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	পরিচয়	কার্তিক, ১৩৩৯
১৭.	সহযাত্রী	১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১৮.	বিশ্বশোক	১১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
১৯.	শেষ চিঠি	৩১ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
২০.	বালক	২ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
২১.	ছেড়া কাগজের ঝুড়ি	২৮ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
২২.	কীটের সংসার	২৮ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
২৩.	ক্যামেলিয়া	২৭ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	বিচিত্রা	কার্তিক, ১৩৩৯
২৪.	শালিখ	২১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
২৫.	সাধারণ মেয়ে	২৯ শ্রাবন, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	প্রবাসী	কার্তিক, ১৩৩৯
২৬.	একজন লোক	১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
২৭.	খেলনার মুক্তি	১৩ আষাঢ়, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন		
২৮.	পত্রলেখা	১৪ আষাঢ়, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন		
২৯.	খ্যাতি	২৪ আষাঢ়, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন		
৩০.	বাঁশি	২৫ আষাঢ়, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন		
৩১.	উন্নতি	২৬ আষাঢ়, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন		
৩২.	ভীরু	৫ শ্রাবণ, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	প্রবাসী	ভাদ্র, ১৩০৯
৩৩.	তীর্থযাত্রী	মাঘ, ১৩৩৯	কলকাতায়	পরিচয়	মাঘ, ১৩৩৯
৩৪.	চির রূপের বাণী	৩ পৌষ, ১৩৩৯ / ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৩২	কলকাতা	পরিচয়	মাঘ, ১৩৩৯
৩৫.	শুচি	১ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ ১৭ নভেম্বর, ১৯৩২	শান্তিনিকেতন	প্রবাসী	পৌষ, ১৩৩৯
৩৬.	রঙরেজিনি	২৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯	বরানগর (প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ - এর গৃহ)	প্রবাসী	চৈত্র, ১৩৩৯
৩৭.	মুক্তি	১৪ মাঘ, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	বিচিত্রা	ফাল্গুন, ১৩৩৯
৩৮.	প্রেমের সোনা	২৪ পৌষ, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	প্রবাসী	ফাল্গুন, ১৩৩৯
৩৯.	স্নানসমাপন	১৫ ফাল্গুন, ১৩৩৯	নেত্রকোণা (বরানগর)	বিচিত্রা	চৈত্র, ১৩৩৯

teachinns Text with Technology

৪০.	প্রথমপূজা	২৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	প্রবাসী	আশ্বিন, ১৩৩৯
৪১.	অস্থানে	২৩ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৪২.	ঘরছাড়া	১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৪৩.	ছুটির আয়োজন	১৭ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	বিচিত্রা	আশ্বিন, ১৩৩৯
৪৪.	মৃত্যু	২৬ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৪৫.	মানবপুত্র	শ্রাবণ, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	প্রবাসী	ভাদ্র, ১৩৩৯
৪৬.	শিশুতীর্থ	শ্রাবণ, ১৩৩৮	শান্তিনিকেতন	বিচিত্রা	ভাদ্র, ১৩৩৮
৪৭.	শাপমোচন	পৌষ, ১৩৩৮	শান্তিনিকেতন	বিচিত্রা	মাঘ, ১৩৩৮
৪৮.	ছুটি	৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	কবিতা	পৌষ, ১৩৪২
৪৯.	গানের বাসা	৩১ ভাদ্র, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---
৫০.	পয়লা আশ্বিন	১ আশ্বিন, ১৩৩৯	শান্তিনিকেতন	---	---

১.৩ নবজাতক (১৯৪০) :

রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থটি ভাবের দিক থেকে কবির কাব্যগ্রন্থলেখনীর বৈশিষ্ট্যগুলি অতিক্রম না করলেও, ভাষা ভঙ্গি আরো কিছু বিষয়ে কবির নূতন পরীক্ষার পরিচয় বহন করছে। রচনাকাল , বিষয় ও মেজাজ অনুসারে নবজাতকের কবিতাগুলি বৈচিত্রপূর্ণ। এখানে কবিভাবনার স্বতন্ত্রতা হল জগৎ ও জীবনকে আর্থ-সামাজিক ও ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নতুন করে আবিষ্কার। স্বার্থলোলুপ জাতির দ্বারা বিধ্বস্ত মানব সভ্যতার জন্য কবির সহানুভূতি, স্বদেশের প্রতি কবির তীব্র বেদনামিশ্রিত ভালোবাসা, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে প্রকৃতির নিষ্পেষন ও ধ্বংস ঘটে চলেছে সে বিষয়েও রবীন্দ্রনাথ অভ্রান্ত ইঙ্গিত দিয়েছেন।

''এ ইতিহাসের শেষ অধ্যায়তলে
রুদ্রের বাণী দিক দাঁড় টানি প্রলয়ের রোষানলে''।

তিনি তো জীবনের কবি, তাই তিনি আশা ছাড়েন না ---

'' আর্তধারার এই প্রার্থনা শুন
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি সার্থক হল পুনঃ ''

কায়মনোবাক্যে কবি প্রার্থনা করেছেন , পৃথিবীব্যাপী মানবাত্মার দুঃখ দুর্দশার অবসান হোক । নবজাতকের কবিতা সংখ্যা পঁয়ত্রিশ (৩৫) । একটি ১৯৩২ সালে একটি ১৯৩৫ সালে । দুইটি ১৯৩৭ সালে দশটি ১৯৩৮ সালে সাতটি ১৯৩৯ সালে , সাতটি ১৯৪০ সালে লেখা ।সাতটির রচনাকালের উল্লেখ নেই । নবজাতক কাব্যের পটভূমিতে কবি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বর্বর লোলুপতা দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার , দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল । 'বুদ্ধভক্তি' 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক কবিতাগুলিতে কবির সেই উষ্মা প্রকাশিত । 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটিতে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভন্ডামি উদঘাটন করেছেন।

''উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো ----
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো ভূমিগর্ভের রাতে ---
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুন সংঘাতে ব্যাপ্ত হয়েছে
পাপের দুর্দহন
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন । ধরার

বক্ষ চিরিয়া চলুক
বিজ্ঞানী হাড়গিলা ।

১৩৪০ এর বিহার ভূমিকম্পের বিভীষিকা, ও বিশ্বভারতীর অধ্যাপক কবি বন্ধু মৌলানা জিয়াউদ্দীনের মৃত্যু কবিকে এমনভাবে পেয়েছিল যে প্রচীন কাব্যধারার পরিবর্তে নতুন ধারা এল 'নবজাতক'। করিমনের ভূমিতে ফললো মননঋদ্ধ পৌঢ় ঋতুর ফসল। চারিদিকে সারাক্ষণ অপূর্ণ শক্তির অপব্যায় ও বিকৃতি দেখেও মানব - জীবনের শাশ্বত মহিমায় বিশ্বাস হারাননি। তার প্রতিফলন ঘটেছে পরিনত বয়সের কাব্য 'নবজাতক' ও --

''যত কিছু খন্ড নিয়ে অখন্ডের দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষ বাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি''।

- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ (ইংরেজী মে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ)
- বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত । প্রকাশক কিশোরী মোহন সাঁতরা।
- 'নবজাতক' কব্যের কবিতাগুলি অমিয় চক্রবর্ত্তীর দ্বারা নির্বাচিত।
- 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ কউকে উৎসর্গ করেননি।
- নবজাতক কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে ২১ টি ইংরেজীতে অনূদিত হয়েছিল ।
- ''এরা বসন্তের ফুল নয়, এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল। বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এরা উদাসীন। ভিতরের দিকের মননজাত অভিঙ্গতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।'' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর --- নবজাতকের ভূমিকা)
- নাম কবিতাটিই 'নবজাতক' কাব্য গ্রন্থের প্রথম কবিতা এবং 'শেষ কথা' এই কাব্যের শেষ কবিতা।

৩. ১. 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত সমস্ত কবিতার নাম, রচনাকাল, ও রচনাস্থান পত্রিকায় প্রকাশ পত্রিকায় প্রকাশকাল প্রকাশস্থান দেওয়া হল-

ক্রমিক	কবিতারনাম	রচনাকাল	রচনাস্থান	পত্রিকায় প্রকাশ	পত্রিকায় প্রকাশকাল
১.	নবজাতক	১৯ আগস্ট, ১৯৩৮	শান্তিনিকেতন	পাঠশালা	কার্তিক, ১৩৪৫
২.	উদ্‌বোধন	২৫ বৈশাখ, ১৩৪৫	কালিম্পং	শতদল/প্রবাসী	জৈষ্ঠ, ১৩৪৭
৩.	শেষদৃষ্টি	১২ জানুয়ারি, ১৯৪০	সেঁজুতি (শান্তিনিকেতন)	----	----
৪.	প্রায়শ্চিত্ত	১৭ আশ্বিন, ১৩৪৫ বিজয়াদশমী	উদয়ন (শান্তিনিকেতন)	প্রবাসী	অগ্রহায়ণ, ১৩৪৫
৫.	বুদ্ধভক্তি	৭ জানুয়ারি, ১৯৩৮	শান্তিনিকেতন	পরিচয়	ফাল্গুন, ১৩৮৮
৬.	কেন	১২ অক্টোবর, ১৯৩৮	শান্তিনিকেতন	প্রবাসী	বৈশাখ, ১৩৮৬
৭.	হিন্দুস্থান	১৯ এপ্রিল, ১৯৩৭	শান্তিনিকেতন	প্রবাসী	পৌষ, ১৩৪৪
৮.	রাজপুতনা	২২জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫	মংপু	প্রবাসী	মাঘ, ১৩৪৫
৯.	ভাগ্যরাজ্য	১৬ ম, ১৯৩৭	আলমোড়া	পরিচয়	শ্রাবণ, ১৩৪৪
১০.	ভূমিকম্প	৬চৈত্র, ১৩৪০	-----	নাচঘর	৩০ চৈত্র, ১৩৪০
১১.	পক্ষীমানব	২৫ফাল্গুন, ১৩৩৮	-----	বিচিত্র	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৯

১২.	আহবান	১এপ্রিল, ১৯৩৯	জোড়াসাঁকো, (কলিকাতা)	----	----
১৩.	রাতের গাড়ি	২৮মার্চ, ১৯৪০	উদয়ন, (শান্তিনিকেতন)	জয়শ্রী	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৭
১৪.	মৌলানা জিয়াউদ্দিন	৮জুলাই, ১৯৩৮	শান্তিনিকেতন	প্রবাসী	শ্রাবণ, ১৩৪৫
১৫.	অস্পষ্ট	২৭মার্চ , ১৯৪০	উদয়ন (শান্তিনিকেতন)	----	----
১৬.	এপারে-ওপারে	২০ বৈশাখ, ১৩৪৬	পুরী	প্রবাসী	শ্রাবণ, ১৩৪৬
১৭.	মংপু পাহাড়ে	১০জুন, ১৯৩৮	মংপু	পরিচয়	শ্রাবণ, ১৩৪৫
১৮.	ইস্টেশনে	৭জুলাই , ১৯৩৮	শান্তিনিকেতন	কবিতা	আশ্বিন, ১৩৪৫
১৯.	জবাবদিহি	২৮ মার্চ, ১৯৪০	উদয়ন (শান্তিনিকেতন)	প্রবাসী	বৈশাখ, ১৩৪৭
২০.	সাড়ে নটা	৮জুন, ১৯৩৯	মংপু	----	----
২১.	প্রবাসী	৯বৈশাখ, ১৩৪৬	পুরী	প্রবাসী	জৈষ্ঠ্য, ১৩৪৬
২২.	জন্মদিন	২৫ বৈশাখ, ১৩৪৬	পুরী	প্রবাসী	আষাঢ়, ১৩৪৬
২৩.	প্রশ্ন	৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮	শ্যামলী (শান্তিনিকেতন)	----	----
২৪.	রোম্যান্টিক	----	----	কবিতা	পৌষ, ১৩৪৬
২৫.	ক্যান্ডীয় নাচ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪	আলমোড়া	প্রবাসী	শ্রাবণ, ১৩৪৪
২৬.	অবর্জিত	৫জুন, ১৯৩৫	পদ্মবোট (চন্দননগর)	প্রবাসী	শ্রাবণ, ১৩৪২
২৭.	শেষ হিসাব	৩ডিসেম্বর, ১৯৩৮ পুনর্লিখন, ৭ জুলাই ১৯৩৯	শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতন	কবিতা ----	আশ্বিন, ১৩৪৬ ----
২৮.	সন্ধ্যা	২০-২২ মে, ১৯৩৭	------	-----	----
২৯.	জয়ধ্বনি	২৬ নভেম্বর, ১৯৩৯	শ্যামলী, (শান্তিনিকেতন)	প্রবাসী	পৌষ, ১৩৪৬
৩০.	প্রজাপতি	১০মার্চ, ১৯৩৯	শ্যামলী (শান্তিনিকেতন)	প্রবাসী	বৈশাখ, ১৩৪৬

teachinns Text with Technology

৩১.	প্রবীণ	----	----	প্রবাসী	পৌষ, ১৩৪৫
৩২.	রাত্রি	২৬ জুলাই, ১৯৩৯	পুনশ্চ (শান্তিনিকেতন)	প্রবাসী	মাঘ, ১৩৪৬
৩৩. ৩৪.	শেষবেলা রূপ-বিরূপ	১১ জানুয়ারি, ১৯৪০ ২৮ জানুয়ারি, ১৯৪০	শান্তিনিকেতন উদীচী (শান্তিনিকেতন)	----- ----	---- ----
৩৫.	শেষকথা	৪ এপ্রিল, ১৯৪০	উদয়ন (শান্তিনিকেতন)	----	----

teachinns Text with Technology

Sub Unit – 2

উপন্যাস

২.১ ঘরে বাইরে প্রথম প্রকাশ সবুজ পত্র - ১৩২১
গ্রন্থাগারে প্রকাশ - ১৯১৬

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর একটি সম্পূর্ণ নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। যে যুগটিকে আমরা আধুনিক বা অতি আধুনিক রূপে অভিহিত করতে পারি। সেই যুগের সূচনাতেও যে নামটি উজ্জ্বল স্বর্নাক্ষরে মুদ্রিত আছে তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের পর উপন্যাসে যে গভীর বাস্তবতার পরিনতি দেখা যায় তার সূচনা প্রথম রবীন্দ্রনাথেই পাওয়া যায়। তিনি রোমান্স ও ইতিহাসের চোরা বালির ভিত্তি থেকে 'উপন্যাস' নামক শিল্পকর্মটিকে সরিয়ে এনে বাস্তব জীবনের সূক্ষ্ম ও রসপূর্ন বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের সব উপন্যাসে একটি করে চরিত্র মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছে। 'বৌঠাকুরানীর - হাটে' বসন্ত রায়, 'রাজর্ষি' তে বিল্বন, 'চোখের বালিতে' অন্নপূর্ণা, 'নৌকাডুবি' জগমোহন 'ঘরে বাইরে'র চন্দ্রনাথবাবু 'যোগাযোগে' বিপ্রদাস আর 'শেষের কবিতা'তে যোগামায়া প্রত্যেকে মধ্যস্থ ভূমিকা পালন করেছে। 'দুইবোন' 'মালঞ্চ' 'চার অধ্যায় এগুলিতে কোন মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেই।

প্রথম চারটি উপন্যাসে এবং 'যোগাযোগ' 'শেষের কবিতা' 'দুই বোন' এবং 'মালঞ্চ' তে উপন্যাসের গল্প সমস্যা নিতান্তভাবে ব্যক্তিমনের। 'নৌকাডুবিতে সমাজ ব্যবহারের সমস্যার কথা প্রাধান্য পেয়েছে। 'গোরা'ই ব্যক্তিধর্ম, সমাজ-ব্যবহার ও দেশসমস্যা সব মিলে কাহিনী প্রাধান্য পেয়েছে। 'চতুরঙ্গে' সংসার জীবনের সমস্যার সঙ্গে আধ্যাত্মা এষনা এবং জীবনের সত্যদর্শন মেলানোর চেষ্টা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য পাঠ্য 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে দেশ উদ্ধারের প্রচেষ্টার সঙ্গে জীবন সমস্যা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির নূতন ধারা এবং উপন্যাসশিল্পে নূতন আঙ্গিকে সৃষ্ট উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসটি প্রথমে ১৩২২ সালে ধারাবাহিকভাবে 'সবুজ পত্রে' প্রকাশিত হয়েছিল। পরে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে। বাংলাদেশে বিংশ শতকের প্রথম দিকে জাতীয় উন্মাদনার মত্ততা আমাদের বিচার শক্তিকে ও ধ্রুব কল্যাণ বুদ্ধিকে কিছুটা অন্ধকার ঢেকে দিয়েছিল। তৎকালীন সমাজ প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে দৃঢ় না থেকে বেশ কিছুটা বিচলিত হয়ে পড়েছিল তারই শান্ত গভীর বিচার 'ঘরে-বাইরে'র অন্যতম উপপাদ্য।

teachinns Learning Text with Technology

উপন্যাসটিতে ১৮ টি (আঠারো) টি পরিচ্ছেদ। প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদে কারো না কারো আত্মকথা। প্রধান চরিত্রগুলি নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ প্রত্যেকের আত্মকথা বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসটিতে। বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন --------- -- ''ঘরে বাইরে (১৯১৫) আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দুইটি স্তর আছে ------ প্রথমটি রাজনৈতিক ও দ্বিতীয়টি সমাজনীতিমূলক''।

[বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

ঘরে বাইরের সমস্যা ঠিক ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত নয়। আদর্শেরও সংঘর্ষ নয়। মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বিবিধ সত্তা থাকে, ব্যক্তির একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

''বিমলার Struggle নিজেরই শ্রেয়ের সঙ্গে প্রেয়ের ------ সন্দীপ নিজের মধ্যে নিজেরই হারজিৎ বিচার করেছে ----- নিখিলেশও নিজের feeling এর সঙ্গে নিজের কর্তব্যের adjustment করেছে। অন্য কোনো মানুষ বা ঘটনা সম্বন্ধে এরা সাক্ষ্য দিচ্ছে না। এদের আত্মানুভূতি নিজের record নিজে রাখছে''। (প্রবাসী বৈশাখ - ১৩৪৮ পৃ ৬৪)

বিমলা ঘরে বাইরের কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছে। বিমলা রূপসী নয়। অদৃষ্টের জোরে ও সুলক্ষণের গুণে সে ধনীগৃহের বধূ হয়েছে। বিমলার স্বামী নিখিলেশ ও কোনো রূপকথার রাজপুত্র নয়। সেইজন্য বিমলার নিখিলেশের ভালোবাসা পাওয়াতে কোনো হীনতাবোধ ছিল না। নিখিলেশ বিমলার দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করতে দেখলাম সন্দীপকে (অবশ্যই কাহিনীর মধ্যে)। সন্দীপ নিখিলেশকে ঠকিয়ে টাকা আদায় করে, সে (সন্দীপ) নিখিলেশের থেকে সুশ্রী। সন্দীপকে দেখে ও তার বক্তৃতা শুনে বিমলা আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল। সন্দীপের প্রতি মত্ত আবেগ বিমলার বিচার বুদ্ধিকে অন্ধ করেছে। নিখিলেশের ধৈর্যশীলতাকে বিমলা দুর্বলতা বলে ভুল করেছে। সন্দীপের জোরালো ব্যক্তিত্ব এই কারনেই বিমলাকে অভিভূত করে ফেলেছে।

কিন্তু ব্যর্থ সজ্জার ''অশ্রুভরা আভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জলভরা আগুনভরা রাঙা মেঘের মতো নিঃশব্দে' সন্দীপের কাছে এসে দাঁড়াল তখনও সে জানত না কতটা সংকট আসন্ন। ক্রমে ক্রমে সন্দীপের লোভীমূর্তিটি বিমলার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অনেক মূল্য চুকিয়ে তবে সন্দীপের মোহজয় করে বিমলা জীবনসত্যের পাঠ নিতে পেরেছে।

ঘরে বাইরের মূল ভূমিকা তিনটি - বিমলা নিখিলেশে, সন্দীপ। বিমলা নিখিলেশের আত্মকথার মধ্য দিয়ে আর যে কটি চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান মেজোরানী আর মাষ্টারমশায়। মাষ্টারমশায়ের মধ্যে নিখিলেশের জীবন-আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে।

রাজনীতির আবহাওয়ায় এই ত্রিকোন প্রেমের উপন্যাসটির কাহিনী-কাঠামি গড়ে উঠেছে। প্রধান তিনটি চরিত্রের জীবন অভিজ্ঞতা ও আত্মোপলব্ধির সত্যই 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য। উপন্যাসের কাহিনী এত দ্রুততার সঙ্গে ছুটে চলেছে, উন্মত্ত ভাবাবেগ সকলের সহজ গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, এই দ্রুত বর্ণনাভঙ্গী প্রায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে নিখিলেশের পূর্বের স্মৃতি রোমন্থন ও বিমলার আত্মগ্লানি সময়ে সময়ে কবিত্বকে মনে পড়িয়ে দেয়। তাই সমালোচক বলেছেন --- ''কিন্তু কলাগত ঐক্য ও ভাবগত সুসংগতিতে -- এক কথায় সাধারন, সমন্বয় -- নৈপুন্য, ইহার সথান খুব উচ্চ''।

কিছু তথ্য

- 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের পরিচ্ছেদ সংখ্যা ১৮। বিমলার আত্মকথা-৭। নিখিলেশের আত্মকথা - ৭ এবং সন্দীপের আতকথা-৪।
- 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র- নিখিলেশ, সন্দীপ, বিমলা, চন্দ্রনাথ মেজরানী, অমূল্য।
- 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখা -- 'শ্রীমান প্রমথনাথ চৌধুরী। কল্যানীয়েষু'

  ''শ্রী যুক্ত রবীন্দ্রনাথ ----- ঘরে বাইরেই আমাদের জাতীয় সমস্যার ছবি একেছেন, কেননা ও উপন্যাসখানি একটি রূপককাব্য ছাড়া আর কিছু নয়। নিখিলেশ হচ্ছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ, আর বিমলা বর্তমান ভারত।'' (সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২২) - প্রমথ চৌধুরী
- ''রবীন্দ্রনাথের যে সব গ্রন্থ নিয়ে রসিক ও আরসিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক আলোচনা হইয়াছে, সে বোধ হয় ঘরে - বাইরে। কারন এই উপন্যাসের আখ্যানাংশে সমাজের এমন সব বিষয়ে আলোচনা আছে, যাহা ইতিপূর্বে কোন লেখক করেন নাই''। (রবীন্দ্র জীবনী) - প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়

উপন্যাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

১) ''পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবি করে, থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরেই অপমানের একশেষ'' বিমলা।

২) ''ঈর্ষা জিনিসটার মধ্যে একটি সত্য আছে, সে হচ্ছে এই যে, যা-কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল''। নিখিলেশ

৩) ''তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের''। বিমলা

৪) ''আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই তো ভারতী''----- সন্দীপের প্রথম বক্তৃতা শোনার পর বিমলার এই উপলব্ধি ঘটে।

৫) ''মেয়েদেরই বিধাতা মানস থেকে সৃষ্টি করেছেন আর পুরুষদের তিনি হাতে করে হাতুড়ি পিটিয়ে গয়েছেন'--- বিমলার জবানীতে সন্দীপের উক্তি।

৪) 'প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিস দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে, সত্যকেও দেখতে পায়না'-- সন্দীপের জবানীতে নিখিলেশের উক্তি।

৫) ''দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।'' -----বিমলার জবানীতে নিখিলেশের উক্তি।

৬) ''জীবনটাকে কঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো''।-----নিখিলেশ।

৭) ''আমি লোভী --- আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম''---- নিখিলেশ।

১০) ''আমি কি রক্তমাংসের ললাটে মোড়া একখানা বই''?----এ আত্মজিজ্ঞাসা সন্দীপের

১১) 'বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে -- কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়'।-------- নিখিলেশ।

১২) ‘তোমার সমন্ধে আমি স্বাধীন, আমার সমন্ধে তুমি স্বাধীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সমন্ধ। কল্যাণের সমন্ধকে অর্থের অনুগত করলে পরমার্থের অপমান করা হয়’ ---- নিখিলেশের জবানীতে চন্দ্রনাথবাবুর উক্তি

১৩) ‘যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা ?’ -- নিখিলেশের জবানীতে চন্দ্রনাথ বাবুর উক্তি।

১৪) ‘সৃষ্টি যে করবে সে নিজের চারিদিককে নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে’। -----নিখিলেশ

১৫) যেটা সত্য সেটা ভালও নয় মন্দও নয়, যেটা সত্য এইটেই হল বিজ্ঞান’
‘যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।’ -------- সন্দীপের আত্মকথা

teachinns
Text with Technology

2.2 চতুরঙ্গ প্রথম প্রকাশ --- সবুজপত্রে অগ্রহায়ণ - ফাল্গুন - ১৩২১ গ্রন্থাকারে -১৯১৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাস রচনার প্রায় ছয় বছর পরে 'চতুরঙ্গ' প্রকাশিত হয় ।প্রথমে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৩২১ সালে অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত মোট চারটি সংখ্যায় যথাক্রমে 'জ্যাঠামশায়' 'শচীশ' 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস' নামে প্রকাশিত হয় । পরে গ্রন্থাকারে ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় । লেখক উপন্যাসটিকে একটি চরিত্রের ডাইরি লেখার ঢঙে অর্থাৎ চরিত্রকথন রীতিতে উপন্যাসটি বর্ণনা করেছেন । 'চতুরঙ্গের' গঠনরীতি সাধারন উপন্যাসের মতো নয় । বইটির চারটি ''অঙ্গ'' বা ভাগ --- 'জ্যাঠামশাই', 'শচীশ', 'দামিনী' ও 'শ্রীবিলাস'----- যেন চারটি গল্প । এই চারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পের মধ্য দিয়ে কাহিনীর বর্ননা চলেছে ।

'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি আকারে বড় নয় । ঘটনার ঘনঘটা এখানে নেই। উপন্যাসটি আসলে শচীশের জীবনসাধনা তথা সত্যানুসন্ধানের ইতিবৃত্ত । প্রথমে শচীশ ছিল জ্যাঠামশাই জগমোহনের মত ও পথের অনুযায়ী । রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে বলেছেন- ''জগমোহনের নাস্তিক ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা''। পরহিত ব্রত সাধন করার মন্ত্রে-ই শচীশ দীক্ষিত ছিল । মৃত্যুর পর জ্যাঠামশাইয়ের নির্দেশ ছিল শবদেহ দান না করে জঙ্গলে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। তা শিয়াল কুকুরের ভক্ষ্য হলে প্রভূততম সুখ সাধনের ব্রতই উজ্জীবিত হবে। এই আদর্শকে শিরেধার্য করেই শচীন একদা সমাজের চোখে পতিতা গর্ভবতী ননীবালাকে বিবাহ করে তাকে সামাজিক স্বীকৃতিও সন্তানকে পিতৃ পরিচয় দান করতে চেয়েছিল । কিন্তু সেই ননীবালা আত্মহত্যার আগে একটি পত্রে লেখে --

'আমি আজো তাহাকে ভুলিতে পারি নাই' - যে তার গর্ভে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েও তাকে গ্রহন করে না, তাকে ভুলতে না পারার রহস্য শচীন বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে না। তখন ইতিবাচক বুদ্ধিসত্তার উপর তার সংশয় তৈরি হয়। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর একাকী হয়ে পড়ে । কিন্তু শচীশের মনে জগমোহনের শিক্ষা এবং প্রভাব শেষ অবধি কাজ করে গেছে।

বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন -''রবীন্দ্রনাথের উপন্যসের মধ্যে চতুরঙ্গের রচনা সর্বাপেক্ষা তীক্ষ ও শিল্প নিপুন'' এই উপন্যাসে অধ্যাত্মসাধনার কথা সহজ ও গভীরভাবে বলা হয়েছে। জগমোহনের মৃত্যুর পর শচীশের অন্তরে যে নিঃসীম গহবর সৃষ্টি হয়েছিল তা যে অধ্যাত্ম ধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে পথ খুঁজেছিল। গুরু লীলানন্দ স্বামীর সঙ্গে তার জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর সাক্ষাৎ ঘটে। সেখানে পরিচয় ঘটে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র দামিনীর সঙ্গে। দামিনী কে তাঁর বিরুদ্ধে গুরু লীলানন্দ স্বামীর পায়ে সমর্পণ করে যান। দামিনী বিধবা তরুণী, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর। জীবনরসের রসিক সে। ননীবালা ও ছিল বিধবা তরুণী, কিন্তু সে মরনরসের রসিক। জীবনে তার কিছুমাত্র আশা ছিল না তাই সে 'মরিয়া জীবনের সুধাপাত্র পূর্ণতর' করে দিয়ে গিয়েছিল। দামিনীর দুর্দমনীয় কামনা শচীশকে লক্ষ্য করে, কিন্তু তা শচীশকে স্পর্শ করতে পারে নি। দামিনীর সেবামাধুর্যে শচীশ মুগ্ধ হয়েছিল তার বেশি কিছু নয়।

অপরদিকে নবীন অবৈধ প্রণয়ে আপন শ্যালিকার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে তার স্ত্রী আত্মহত্যা করে। রসের রাক্ষসীর এই নগ্নরূপ দেখে শচীশ রসসাধনার বিপদ ও অসম্পূর্ণতা অনুভব করে। শচীশ বুঝল দামিনী তারই আর এক রূপ দামিনীর বিপদ শচীশের নিকট থেকে যতটা নিজের থেকে আরো বেশি। দামিনীর কথায় শচীশের রসের ঘোর কেটে গেল। লীলানন্দ- স্বামীর দলও ভেঙ্গে গেল, অন্তত শচীশ - দামিনী শ্রীবিলাসের সম্পর্কে। শচীশ ও রসের জগত থেকে মুক্তি পেতে চায়। একদিন ঝড় বৃষ্টির রাতে দামিনী শচীশের ঘরে ঢোকে। শচীশ দামিনীকে প্রত্যাখান করে। পরে দামিনী শচীশের মনের সব আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। শচীশকে গুরুরূপে বরন করে নেয়। পরবর্তীকালে শ্রীবিলাসের সঙ্গে দামিনীর সম্পর্ক গড়ে ঔঠে। শ্রীবিলাসের সংকোচ প্রেমে দামিনীর আত্মসমর্পণ ঘটে। অপরদিকে শচীশের আত্মার গভীরে সত্যের যে পিপাসা তাকে সে প্রত্যক্ষ করেছে নিসর্গ প্রকৃতিতে, বিশ্বব্যাপী অরূপের লীলাসঙ্গীতের অনুভবে। তাই অরূপের অভিমানে তার মানসযাত্রা।

রবীন্দ্রনাথ শচীশের এই জীবন সাধনার মধ্যে দিয়ে জীবনের একরকম সত্য উদ্ভাসিত হলেও সেই সাধনায় ব্রতী সকলে হতে পারে না। সেদিকে থেকে শচীশ আপনাতে আপনি মগ্ন। অন্যদিকে শ্রীবিলাস স্বভাবিক মানুষ। শ্রীবিলাসের কাছে সংসার মায়ার ফাঁদ নয়। নারী সৌন্দর্যে সে উদাসীন নয়। শচীশ দামিনীকে তাঁর মুক্তির ও সাধনার পথের অন্তরায় ভেবে ত্যাগ করে। অপরদিকে শ্রীবিলাস দামিনীকে বিবাহ করে সংসারের স্বপ্ন দেখে। জন্মজন্মান্তরে শ্রীবিলাসকে স্বামী হিসাবে পাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। দামিনীর হৃদয়ে শচীশের জন্য যে জায়গাটা আছে, সেখানে কেউ ভাগ বসাতে পারে নি। শ্রীবিলাস জানে যাদের আছে --'লুব্ধ ললসার দুর্দান্ত মোহ' কিংবা 'বিভোর ভাবুকতার রঙিন মায়া' শ্রীবিলাসের মধ্যে দুটির কোনটি নেই। শচীশের মধ্যে 'বিভোর ভাবুকতার রঙিন মায়া' বর্তমান। আবশেষে দামিনীর হঠাৎ মৃত্যুতে অচরিতার্থ প্রেমের বেদনা মৃত হয়ে থাকল।------

''যেদিন মাঘের পূর্ণিমা ফাল্গুনে পড়িল, জোয়ারে ভরা অশ্রুর বেদনায় সমস্ত সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন দামিনী আমার পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।''

ড: সুকুমার সেন 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খন্ডে বলেছেন ---- ''চতুরঙ্গের চরিত্র চারটি ------ জগমোহন, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। তাহার মধ্যে প্রথমটি যেন শচীশেরই পূর্ব ভূমিকা। চতুরঙ্গ নামের দুটি অর্থ আছে । এক রচনাটি চারটি অঙ্গে বিভক্ত, দুই, দাবাখেলা------চারিজনে মধ্যে, শচীশ, দামিনী লীলানন্দ স্বামী ও শ্রীবিলাস জগমোহন হলেন 'বাজী' বা 'ঠাকুর' (অর্থ্যাৎ Stake) বাকী চারজন হলেন দাবার খুঁটি।

তথ্য

১) স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস 'চতুরঙ্গ'(১৯১৬) সালে ।

২) 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে মে সংখ্যা পর্যন্ত 'Modern Review' পত্রিকায় 'Story in Four chaptres' নামে মুদ্রিত হয়, এই পত্রিকা পাঠটি কিছু ভাষাগত ও পরিচ্ছেদ বিন্যাসগত পরিবর্তনের পর ১৯২৫ সালে ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত। 'Broken Ties and other stories' গ্রন্থের অনুভুক্ত হয়ে 'Broken Ties' নামে মুদ্রিত হয়।

গুরত্বপূর্ন উদ্ধৃতি

১. ''নাস্তিককে নরঘাতকের চেয়ে, এমন কি, গো- খাদকের চেয়েও পাপিষ্ট বলিয়া জানিতাম''--- শ্রীবিলাস (জ্যাঠামশায়)

২. ''যাহার দশের মতো, বিনা কারণে দশের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ বাধে না ''--- শ্রীবিলাস (জ্যাঠামশায়)

৩. ''সংসার মানুষকে পোদ্দারের মতো বাজাইয়া লয়, শোকের ঘা, ক্ষতির ঘা, মুক্তির লোভের ঘা দিয়া।'' জ্যাঠামশায় (শচীশ)

৪. ''যে বলিল, বিশ্রী, জ্যাঠামশায় যখন বাঁচিয়া ছিলেন তখন তিনি আমাকে জীবনের কাজের ক্ষেত্রে মুক্তি দিয়েছিলেন, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় খেলার আঙিনায়; জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পরে তিনি আমাকে মুক্তি দিয়াছেন রসের সমুদ্রে, ছোটো ছেলে যেমন মুক্তি পায় মায়ের কোলে''। শচীশ (শচীশ)

৫. ''যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়।'' [শচীশ জ্যাঠামশায়]

৬. ''মানুষের ভিতরকার দীপ্যমান সত্যপুরুষটি স্থূলতা ভেদ করিয়া যখন দেখা দেয় তখন অকারনে কেহ বা তাহাকে প্রাণপণে পূজা করে, আবার অকারনে কেহ বা তাহাকে প্রাণপণে অপমানে করিয়া থাকে''। শ্রীবিলাস [জ্যাঠামশায়]

৭. ''বোলতার বাসা ভাঙিয়া দিলেই তবে বোলতা তাড়ানো যার'' --- জগমোহন। [জ্যাঠামশায়]

৮. ''মা আমার ঘরে ঘরে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে। তাই নিন্দায় কোটালের বান ডাকিবার সময় আসিল, কিন্তু ঢেউ যতই ঘোলা হউক, আমার জ্যোৎস্নায় তো দাগ লাগিবে না?

৯. ''ব্রহ্মরা নিরাকার মানে, তাহাকে চোখে দেখা যায় না। তোমরা সাকারকে মান, তাহাকে কানে শোনা যায় না। আমার সজীবকে মানি; কানে শোনা যায়, তাহাকে বিশ্বাস না করিয়া থাকা যায় না।'' জগমোহন [জ্যাঠামশায়]

১০. ''দামিনী যেন শ্রাবনের মেঘের ভিতরকার দামিনী। বাহিরে সে পুঞ্জ পুঞ্জ যৌবনে পূর্ণ; অন্তরে চঞ্চল আগুন ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছি।''

১১. ''মাটির বাসার দিকেই দামিনীর টান, আকাশের দিকে নয়।'' [দামিনী]

১২. ''ফাঁকিই সহজ, সত্য কঠিন।'' --- শচীশ [শ্রীবিলাস]

১৩. ''যে মুখে তিনি আমার দিকে আসিতেছেন আমি যদি সেই মুখেই চলিতে থাকি তবে তাঁর কাছ থেকে কেবল সরিতে থাকিব, আমি ঠিক উলটা মুখে চলিলে তবেই তো মিলন হইবে।'' শচীশ [শ্রীবিলাস]

১৪. ''তিনি মুক্ত তাই তাঁর লীলা বন্ধনে, আমারা বদ্ধ সেই জন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।'' - শচীশ [শ্রীবিলাস]

Sub Unit - 3

ছোটো গল্প

নিশীথে, দুরাশা, স্ত্রীর পত্র, হৈমন্তী, ল্যাবরেটরী

রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের ছোটো গল্পের প্রথম সার্থক রূপকার ।রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন -

‘‘ ছোটোগল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ই তাহা বঙ্গ সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন’’।
(সাহিত্য সাধক চরিতমালা)

রবীন্দ্রনাথ ছোটো-গল্পের আঙ্গিক তথা শিল্পরূপ কেমন হবে, পাঠকের মনে কি ধরনের ,সাড়া জাগাবে সে বিষয়ে তিনি নিজেই আলোচনা করেছেন।..... বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। ভিতরে রবীন্দ্রনাথের হাতে প্রচুর অবসর।বিদেশী গ্রন্থ পড়তেও ইচ্ছে করছে না। তখন তাঁর মনে হয়েছে -

‘‘ ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোট প্রান, ছোট ব্যাথা, ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু চারিটি অশ্রুজল। নাহি বর্ণনার ছটা,
ঘটনার ঘনঘটা নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে, সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ,’’ (বর্ষাযাপন)

রবীন্দ্রনাথ কলকাতা ও শান্তিপুরের মধ্যবর্তী ভাগীরথীতীরে যে গ্রাম বাংলার দৃশ্য দেখেছিলেন তা থেকে গল্পরচনার ‘প্রথম প্রেরনা পান। তার প্রথম গল্পদুটি ‘রাজপথের কথা’ এবং ‘ঘাটের কথা’। ‘সরোজিনী প্রয়াণ’ প্রবন্ধে গল্প দুটির বাস্তব ভূমিকা রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প-রচনার সূত্রপাত ১২৯০-৯১ সালে। দুটি মাত্র গল্প প্রকাশ করে সাত বৎসর ক্ষান্ত ছিলেন।১২৯৮ সালে ‘হিতবাদী’ পরে ‘সাধনা’ পত্রিকা বের হলে রীতিমত ছোটগল্প লিখতে প্রবৃত্ত হন।

রবীন্দ্রনাথের গল্পলেখার প্রথম প্রচেষ্টা ‘ভিখারিণী’। কিন্তু গল্পটি শিল্পোত্তীর্ন হয়নি। তিনি নিজেই গল্পটিতে তাঁর সাহিত্য ভান্ডারে স্থান দিতে চাননি।১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ন মাসে রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ সহোদর দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় সাধন পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হিতবাদীর পর রবীন্দ্রনাথ সাধানায় নিয়মিত গল্প লিখতেন। ‘হিতবাদীর ’ প্রথম গল্প ‘দেনাপাওনা’ যা রবীন্দ্রনাথের প্রথক সার্থক ছোটো গল্প। পদ্মাতীরের সুখ-দুঃখ-বিরহ মিলনপূর্ণ ভালবাসা স্মৃতি তার ছোট গল্পগুলিতে বার বার ধরে পড়েছে। এর পর তাঁর লেখা ছোট গল্পগুলি ক্রমান্বয়ে সাধনা,হিতবাদী ভারতী ও সবুজপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

অসীম কল্পনাশ্রয়ী রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর তদারকি করতে গিয়ে বাস্তবের যে স্পর্শ লাভ করেছেন তার থেকে সূচনা রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প। তাঁর ছোটো গল্পগুলি রচনার প্রধান গৌরব তাঁর ভাষা ও বাচনভঙ্গী। যে ভাষা তিনি নিজে সৃষ্টি করেছিলেন , তাঁর রচনারীতি বা স্টাইল রবীন্দ্রনাথকে ছোটগল্পে অমর করে রেখেছে।রবীন্দ্রনাথ বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন কবি হিসেবে । কবিখ্যাতি বাদ দিলেও গল্প লেখক হিসেবে তাঁর স্থান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গল্পলেখকদের নিচে নয়- গল্পের উৎকর্ষে ভাব-গাম্ভীর্যে আঙ্গিক কুশলতায়,ব্যঞ্জনায় প্রতীতির সমগ্রতায়।

আমাদের পাঠ্য আলোচ্য গল্পগুলির নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হল। :-

মূল গল্প	প্রথম প্রকাশিত পত্রিকার নাম	প্রত্রিকায় প্রকাশকাল
নিশীথ	সাধনা	মাঘ, ১৩০১
দুরাশা	ভারতী	বৈশাখ, ১৩০৫
স্ত্রীর পত্র	সবুজপত্র	শ্রাবণ, ১৩২১
হৈমন্তী	সবুজপত্র	জৈষ্ঠ, ১৩২১
ল্যাবরটরী	আনন্দবাজার	১৫ ই আশ্বিন ১৩৪৭ (শারদীয়া সংখ্যা)

নিশীথে (১৩০১ মাঘ মাসে)

'সাধনা' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষে মাঘ মাসে রবীন্দ্রনাথের লেখা 'নিশীথে' গল্পটি বের হয়। শব্দসংখ্যা আনুমানিক তিন হাজার আটশত। পরিচ্ছেদে বিভক্ত নয়। কাহিনীটি মোটামুটি দাম্পত্য প্রেমের, গল্পের নায়ক দক্ষিণাচরণের প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্ত্রী মনোরমাকে গ্রহণ করেন। মনোরমার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হলেও প্রথমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ---

'এ জীবনে আর কাহাকেও ভালোবাসিতে পারিব না'র অন্তসারশূন্য তা তাকে পীড়িত করে। প্রথমা স্ত্রীর প্রেমানুভূতি, কর্তব্য ও নিষ্ঠা, তার গৃহিণীপনার নিরুপদ্রব আকর্ষণ গল্পের নায়ককে আকর্ষণ করে। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত প্রথম স্ত্রীকে সরিয়ে দিতে সফল হন দ্বিতীয় স্ত্রীর বাবা হারান ডাক্তার, তখনো দক্ষিনাচরণ কোনো প্রতিবাদ জানাতে পারেনি। তার মৃত্যুর জন্য দক্ষিণাচরণ নিজেকে দায়ী মনে করে। সেই অপরাধবোধ তাকে পীড়িত করে। দ্বিতীয়া সম্পর্কে প্রথমার বিস্ময়াবিস্ট জিঙ্গাসা -- 'ওকে, ওকে, ও কে গো' দক্ষিণাচরণের হৃদয়মাঝে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। গল্পের আরম্ভটা ভৌতিক মনে হলেও এটা কোন ভৌতিক গল্প নয়। এই গল্প আমাদের সংসার জীবনের এক জটিল মনোবিকারের গল্প।

Text with Technology

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

১। গল্পটি প্রথম 'সাধনা' পত্রিকায় মাঘ ১৩০১ -এ প্রকাশিত হয়।
২। মূল গল্পগ্রন্থ - 'গল্প দশক' (১৩০২)।
৩। পরবর্তীকালে গল্পটি 'গল্পগুগচ্ছ- ২' এর অন্তর্ভুক্ত হয়।
৪। 'নিশীথে গল্পটি শুরু হয় অর্ধেক রাত্রি। রাত্রি আড়াইটা।
৫। গল্পের জমিদারবাবুর নাম দক্ষিণাচরণ
৬। দক্ষিণাচরণ কাব্যশাস্ত্রটা ভালো অধ্যয়ন করেছিলেন বলে তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কাছে কালিদাসের নিম্নধৃত শ্লোকটি বলতেন- ''গৃহিনী সচিব'' সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ''।
৭। কিন্তু তাঁর স্ত্রী শুনতে চাইতেন না । এই প্রসঙ্গে তাঁর তুলনা 'গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড়ো বড়ো কাব্যের টুকরো এবং ভালো ভালো আদরের সম্ভাষন মূহুর্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত'।
৮। 'তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল '---তঁহার বলতে দক্ষিণাচরণ বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী ।
৯। দক্ষিণাচরণবাবুর বরানগরের বাড়ি ছিল। বরানগরের বাড়ির সামনেই বাগান এবং বাগানের সম্মুখেই ছিল গঙ্গা
১০। শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিনের দিকে জমিতে মেহেফির বেড়া দিয়ে তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী একটুকরো বাগান বানিয়েছিলেন।
১১। বাগানে বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ করবী এবং রজনীগন্ধারই প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী ।
১২। দক্ষিণাচরণবাবুর স্ত্রী গৃহে শয্যাগত থাকার পর চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় বাগানে গিয়ে বসতে চান ।
১৩। দক্ষিণাচরণবাবু তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে নিয়ে এলাহাবাদে বায়ু পরিবর্তন করতে যান ।
১৪। এলাহাবাদে হারান ডাক্তার দক্ষিণাবাবুর স্ত্রীর চিকিৎসা করেন ।
১৫। হারান ডাক্তার দক্ষিণাচরণবাবুর স্বজাতীয় ছিলেন ।
১৬। হারান ডাক্তারের একটি পনেরো বছর বয়সের মেয়ে ছিল ।নাম মনোরমা মেয়েটির যেমন সুরূপ তেমনি সুশিক্ষা ।

১৭। দক্ষিণাচরণবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ হয় মনোরমার সঙ্গে ।
১৮। হারান ডাক্তার দক্ষিণাচরণবাবুর স্ত্রীকে দু শিশি ওষুধ দিয়েছিলেন । একটি খাবার আর একটি মালিশ করবার ।
১৯। মালিশ করবার ওষুধটি দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথম স্ত্রী খেয়ে মৃত্যুবরন করেন।
২০। একটা লাল শাল মনোরমার মুখখানি বেষ্টন করে তার শরীরটি আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।
২১। গল্পের শুরু ও শেষ 'ডাক্তার, ডাক্তার' দিয়ে।
২২। 'ও কে? ও কে? ও কে গো?- উদ্ধৃতিটি 'নিশীথে' গল্পের অর্ন্তগত ।
২৩। ডঃ সুকুমার সেন 'নিশীথে' গল্পটিকে বলেছেন - 'ভূত ছাড়াই ভূতের গল্প।'
২৪। 'তোমার ভালোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না' - [জমিদার বাবুর স্ত্রী সম্পর্কে]
২৫। 'এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ নইলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে'- দুটি মানুষ বলতে এখানে দক্ষিণাচরণবাবু ও মনোরমাকে বোঝানো হয়েছে।

দুরাশা

রবীন্দ্রনাথের 'দুরাশা' গল্পটি ভারতী (বৈশাখ -১৩০৫) পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম গল্প। ১৩০৭ বঙ্গাব্দে গল্প নামক গল্পসংকলনে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।পরবর্তীকালে গল্পগুচ্ছ-২ তে স্থান পেয়েছে। প্রেমের একনিষ্ঠ অনুসরণে ভাগ্যের বঞ্চনা গল্পের বিষয়।বদ্রাওনের গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী মেহের উন্নিসার এক স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী। তাদের ফৌজের অধিনায়ক কেশরলাল ছিল সংযত শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণ। কেশরলালের নিষ্ঠাই মেহেরউন্নিসার হৃদয়ে প্রেম - বন্যা সৃষ্টি করে। এই প্রেম ছিল ভক্তি ও শ্রদ্ধারূপে। কেশরলাল তার কাছে দেবতা তাই সিপাই বিদ্রোহের অনতম নেতা শুদ্ধ ব্রাহ্মন কেশরলাল মৃত্যুযন্ত্রণার সময়েও ইংরেজভক্ত বেইমান নবাব কন্যার জল প্রত্যাখান করে। ব্রাহ্মণের নির্লিপ্তিতা, নিরাসক্তি নবাবপুত্রীকে মোহাচ্ছন্ন করেছিলেন। তারপর নবাবপুত্রী দীর্ঘদিন ধরে শিবানন্দ স্বামীর কাছে ভক্তি ভরে শাস্ত্র শিক্ষা করে ভৈরবী বেশে তীর্থে - মঠে মন্দিরে ভ্রমণ করতে করতে কেশরীলালের সন্ধান করতে থাকেন। আটত্রিশ বছর পরে নবাবদুহিতা একাকিনী ভ্রমণের পর অবশেষে দার্জিলিং এর অনাচারী, ভুটিয়া পল্লীতে এসে কেশরলালের ভুটিয়া স্ত্রী ও তার সন্তানদের সন্ধান পান। মেহেরউন্নিসার একটি ফুৎকারেই প্রেমপূর্ণ ভক্তির প্রদীপ নিভে গেল। নবাবদুহিতা বুঝতে পারল যে ব্রাহ্মণ একদিন তার কিশোরী হৃদয় হরণ করেছিল তা অভ্যাস,সংস্কার মাত্র। গল্পের মুসলমান ব্রাহ্মণী, বিপ্রবীর, যমুনা তীরের কেল্লা কিছুই সত্য নয়। সত্য হল আচার ধর্মের উপর হৃদয় ধর্মের শ্রেষ্ঠতা। 'দুরাশা' গল্পেই প্রথম অবিবাহিত নারী প্রেমের কারনে গৃহত্যাগ করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- দুরাশা গল্পের শুরুতে গল্পকথক দার্জিলিঙে গিয়ে হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সেরে পায়ে মোটা বুট এবং ম্যাকিন্টশ পরে বেড়াতে বের হন।
- জনশূন্য দার্জিলিঙের ক্যালকাটা রোডে গৈরিক বসনাবৃতা রমণীকণ্ঠের সকরুন রোদনধ্বনি শুনতে পান তার মস্তক স্বর্নময় জটাভামর চূড়া - আকারে আবদ্ধ।
- মেয়েটি আসলে ছিল নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী।
- গল্পকথকের মতে গোলামকাদের খাঁর পুত্রী নুরউন্নীসা বা মেহেরউন্নীসা বা নুর - উন্মূল্ক।
- 'দুরাশা' গল্পে কালিদাসের 'মেঘদূত' ও 'কুমারসম্ভবে'র উল্লেখ আছে।
- নবাবপুত্রী বেগম সহেবদের কেল্লা ছিল যমুনার তীরে।তাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিলেন একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তার নাম ছিল কেশরলাল। কেশরলাল প্রতিদিন প্রত্যুষে যমুনার জলে স্নান করে সুকণ্ঠে ভৈঁরো রাগে ভজন গান করতেন। নবাবপুত্রীর একজন হিন্দুবাদি ছিল।
- নবাবপুত্রী তার হিন্দু দাসীর থেকে সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবদেবীর সমস্ত আশ্চর্য কাহিনী রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত ইতিহাস শুনতেন।
- 'হিন্দু সংসার আমার বালিকা হৃদয়ের নিকট একটি পরমরমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল'-বালিকা হৃদয়টি হল নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রীর হৃদয়।
- নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রী প্রথম যেদিন অন্তঃপুর থেকে বাইরে আসেন তখন তিনি ষোড়শী। গোলামকাদের খাঁর পুত্রী যোগিনীর বেশে কাশীর শিবানন্দ স্বামীকে পিতৃ সম্বোধন করে তার কাছে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন।
- কেশরলাল তাঁতিয়া টোপির দলে মেশে।
- কেশরলাল রাজদন্ডের ভয়ে পালিয়ে গিয়ে নেপালে আশ্রয় নেন।
- বেগমসাহেব আটত্রিশ বছর পর দার্জিলিঙে ভুটিয়াপল্লীতে কেশরলালের সাক্ষাৎ পান।সে তার গর্ভজাত পৌত্র-পৌত্রী নিয়ে স্নানবস্ত্রে মলিন অঙ্গে ভুট্টা থেকে শস্য সংগ্রহ করছিলেন।

- ‘আমার চালচলন সমস্তই সাহেবি’ - গল্পকথক
- ‘আমার তরী তীরে আসিয়া পৌছিয়াছে, আমার জীবনের চরম তীর্থ অনতিদূরে - (নূরউন্নীসা)
- ‘অদৃষ্টের রহস্য কে জানে আমরা তো কীট মাত্র।’

স্ত্রীর পত্র

‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পটি (শ্রাবন ১৩২১) ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । ১৩২৩ বঙ্গাব্দে ‘গল্প সপ্তক’ এ প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় । পরবর্তীকালে গল্পটি ‘গল্পগুচ্ছ ৩’ -এর অর্ন্তভুক্ত হয়। পুরাতন জীর্ন সংস্কার ভাঙ্গবার যে সুর ‘বলাকা’র প্রথম তিনটি কবিতার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল তাই যেন রূপ পেয়েছে সবুজপত্রের গল্পধারায় । নারীর যে একটি ব্যাক্তিস্বতন্ত্র্য আছে তা এই পুরুষশাসিত সমাজ স্বীকার করতে চায় না । সংসারের নাম রক্ষার জন্য সমাজের নাম রক্ষার জন্য , সকল প্রকার অসত্যের সঙ্গে আপোস করে থাকাই নারীধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ এর প্রথম নির্বাক প্রতিবাদ হয়েছে ‘হৈমন্তী’ র জীবনে । কিন্তু ‘স্ত্রীর পত্রে’ মৃনাল স্পষ্ট করে জানিয়েছে ----

‘‘ আমার জগৎ এবং জগদীশ্বরের সঙ্গে আমার অন্য সম্বন্ধও আছে এ তোমাদের মেজ বউয়ের চিঠি নয়’’।

তাই সে বলল ---

‘‘আমার মধ্যে যা কিছু মেজবৌকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা পছন্দ করনি, চিনতেও পার নি’’।

এক চরম অসহায়তার মধ্যে মৃণালের জা এর বোন বিন্দু শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। মৃণাল এই লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করেনি। কলকাতার ২৭ নম্বর মাখন বড়ালের গলির মেজ বউ এর খোলস পরিত্যাগ করে হয়ে উঠেছে মৃণাল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠিত এক নারী। রবীন্দ্রনাথ মৃনাল চরিত্রের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের নারীদের লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণার নগ্নরূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

তথ্য এবং মন্তব্য

১) ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পের শব্দসংখ্যা আনুমানিক চার হাজার পাঁচশত।
২) মূল গল্পগ্রন্থ ----- ‘গল্প - সপ্তক’(১৩২৩)।
৩) পরবর্তীকালে গল্পটি ‘গল্পগুচ্ছ --৩’ এর অর্ন্তগত হয়।
৪) ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পটি লিখেছে মেজোবউ মৃণাল।
৫) পত্রটি শুরু হয়েছে ‘শ্রীচরনকমলেষু’ সন্মোন্ধন জানিয়ে এবং শেষ হয়েছে ‘তোমার চরনতলাশ্রয়ছিন্ন’ বলে।
৬) মৃণালের অর্থাৎ মেজো বউ এর বিবাহ হয়েছে পনেরো বছর বয়সে। এত বছর একটি চিঠিও লেখেনি মৃণাল।
৭) মৃণালের নিবাস কলিকাতায়।
৮) মেজোবউ তার স্বামীকে চিঠি লিখেছে তীর্থে এসে শ্রীক্ষেত্রে থেকে।
৯) মৃণাল ও তার ভাই একসঙ্গে শিশু রয়সে জ্বরে পড়ে। ভাইটি মারা যায়।
১০) মৃণালকে বিবাহের জন্য দেখতে আসে তার স্বামীর দূর সম্পর্কের মামা এবং তার স্বামীর বন্ধু নীরদ।
১১) দুর্গম পাড়াগাঁয়ে মৃনালদের বাড়ি। সেখানে দিনের বেলায় শেয়াল ডাকে। স্টেশন থেকে সাত - ক্রোশ ছ্যাক্ড়া গাড়িতে এসে তিন মাইল কাঁচা রাস্তা পালকি করে তবে মৃণালদের গায়ে পৌছানো যায় এ প্রসঙ্গে তার মা ভয়ে দুর্গানাম জপ করে। কারন
‘শহরের দেবতা কে পাঁড়াগায়ের পূজারি কী দিয়ে সন্তুষ্ট করবে’ সে ভেবে।
১২) বড় বউয়ের রূপের অভাব ছিল। মেজো বউ মোটের উপর সুন্দরী বটে।
১৩) মৃণালের যে রূপ আছে সে - কথা ভুলতে তার শ্বশুরবাড়ির বেশিদিন সময় লাগেনি । কিন্তু তার যে বুদ্ধি আছে সেটা পদে পদে স্মরণ করতে হয়েছে ।
১৪) মৃণাল লুকিয়ে কবিতা লিখত। সেটা শ্বশুরবাড়ির কেউ জানত না।
১৫) মৃণালের শ্বশুরবাড়িরতে মৃণালকে ‘মেয়ে-জ্যাঠা’ বলে দুবেলা গাল দিত।
১৬) মৃণালের শ্বশুর ঘরের স্মৃতির মধ্যে সবচেয়ে যেটা মনে জাগে সেটা হল তাদের গোয়াল ঘর। অন্দরমহলের সিড়িতে ওঠবার ঠিক পাশের ঘরে তাদের গোরু থাকে । তদের জন্য উঠোনের কোনে জাবনা দেবার কাঠের গামলা। তাদের গৃহে দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুর। মৃণালের কাছে সেই দুটি গোরু এবং তিনটি বাছুরই সমস্ত শহরের মধ্যে তার চির পরিচিত আত্মীয়ের মতো।
১৭) মৃণালের মেয়েটি জন্ম নিয়ে মারা যায়।
১৮) মৃণালের বড় জায়ের বোন বিন্দু। কিছু তার বিধবা মায়ের মৃত্যুর পর খুড়ততো ভাইদের অত্যাচারে মৃনালের শ্বশুর বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। বিন্দুর দিদি তার স্বামীর অনিচ্ছা থাকার জন্য বিন্দুকে আপদ ভাবতে থাকে।

১৯) বিন্দুর বয়স চোদ্দর কম ছিল না । বিন্দু দেখতে খুব মন্দ ছিল।
২০) বিন্দুর প্রতি সবাই মনে বিরক্ত তাই মৃণাল তার পাশে দাঁড়ায়।
২১) মৃণালের ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি হলে মৃণালকে সন্দেহ করা হয়।
২২) বিন্দুকে মৃণাল যেসব কাপড় পরতে দিত, তা দেখে মৃণালের স্বামী রাগ করে মৃণালের হাত খরচের টাকা বন্ধ করে দেয়। মৃনালও পাঁচসিকে দামের জোড়া মোটা কোরা কলের ধুতি পরতে আরম্ভ করে।
২৩) বিন্দুর স্বমী পাগল।
২৪) বিন্দুর শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না-কিন্তু তিনি বিন্দুর শাশুড়িকে যমের মতো ভয় করতেন।
২৫) মৃণালের শ্বশুরবাড়ির বাড়ির সমনে বিষম গোল পাকায় বিন্দুর ভাশুর।
২৬) মৃণালের ছোট ভাই শরৎ।
২৭) বিন্দুর খবর আনতে মৃণাল শরৎকে বলে।
২৮) মৃণালের শ্রীক্ষেত্র যাবার দিন বুধবার। আর সমস্ত কিছু ঠিক রবিবার।
২৯) শরৎ বিন্দুকে পুরী নিয়ে যাবার জন্য যেদিন তার বাড়ী যায় ঠিক তার আগের দিন কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে।
৩০) মৃণাল তার কথায় 'মীরাবাঈ'-এর গানের ইঙ্গিত দেন।
৩১) 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথের 'পলাতক' কাব্যের সুর আছে।

গুরুত্বপূর্ণ লাইন

১। 'মেয়ে কিনা, তাই ও বাঁচল, বেটাছেলে হলে কি আর রক্ষা পেত' ---
মেয়ে বলতে এখানে মৃণাল কে বোঝানো হয়েছে।
২। 'কটু কথাই হচ্ছে অক্ষমের সম্মান '।
(শ্বশুর বাড়ির মানুষজনদের উদ্দেশ্যে)
৩। 'মা হবার দুঃখটুকু পেলুম, কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না''।
(মৃণালের মেয়ে মারা যাওয়া প্রসঙ্গে)
৪। 'হাজার রূপে গুনেও মেয়ে মানুষের সংকোচ কিছুতে ঘোচে না' --- 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের অর্ন্তগত
৫। ''বিশ্বসংসারে তার যেন জন্মবার কোন শর্ত ছিল না''। (বিন্দুর অবস্থা প্রসঙ্গে)
৬। ''যাকে বাধা মেনে চলতে হবে, যে যদি বুদ্ধিকে মেনে চলতে চায়, তবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাঙবেই''---
'স্ত্রীর পত্র' গল্পের অবলম্বন
৭। 'ওর জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে, তোমার পা এত লম্বা নয় । মৃত্যু তোমাদের চেয়ে বড়ো। সেই মৃত্যুর মধ্যে সে মহান' --- ওর = বিন্দু তোমাদের - মৃণালের শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের
৮। 'আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ'---
আমার = মৃণালের
৯। 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক মা, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগে রইল প্রভু --তাতে তার যা হবার তা হোক'।
১০। ''এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা আমিও বাঁচব। আমি বাঁচলুম''। (চিঠির শেষ)

হৈমন্তী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হৈমন্তী' গল্পের কাহিনীর সঙ্গে 'দেনাপাওনা' গল্পের উপর - উপর কিছু মিল আছে। 'হৈমন্তী' গল্পটি প্রথমে 'সবুজপত্রে' প্রকাশিত হয় (জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১) ১৩২৩ বঙ্গাব্দে 'গল্পসপ্তক' এ গল্পটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় পরবর্তীকালে গল্পটি গল্পগুচ্ছ-৩ এর অন্তর্ভুক্ত হয়।

'হৈমন্তী' গল্পের কথক অপুর বাবা তার বিবাহ দেন গৌরীশংকর বাবুর সতেরো বছরের মেয়ে মাতৃহীনা হৈমন্তীর সঙ্গে। জনশ্রুতি অনুযায়ী হৈমন্তীর পিতা যত বড়লোক ততটা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য গৌরীশংকর বাবুর ছিল না। তা জানতে পেরে অপুর পিতা আর্থিক ক্ষতির কারণে হতাশা হন। হৈমন্তীর প্রকৃতিও তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। সর্বদা বিরুদ্ধ বিষবাষ্পে যেন হৈমন্তীর শ্বাসরোধ হচ্ছিল। হৈমন্তী স্পষ্ট এবং সত্যভাষী। সে নারী, সংসারের সব অত্যাচার সে মুখ বুজে সহ্য করেছে কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে পিতার অপমান সহ্য করতে পারল না। কারণ সে তো বাবার মেয়ে - বিভা এলার সমগোত্রীয় গল্পের পরিণতি 'হৈমন্তীও 'নিরুপমার মত কি শ্বশুর গৃহের নিষ্ঠুর নির্যাতনের বলিসরূপ। তবে নিরূপমার স্বামী -

স্ত্রীর দুঃখ প্রত্যক্ষ করেন নি। হৈমন্তীর স্বামী তা প্রত্যক্ষ করলেও প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে নি বলে আত্মধিক্কার দেখা দিয়েছে।

তথ্যচুম্বক

১) 'হৈমন্তী' গল্প গল্পকথকের নাম অপু।
২) অপুর সঙ্গে হৈমন্তীর বিবাহ দেবার জন্য 'কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না।'
৩) অপুর কথায় -- 'না পারিলাম বাংলার শিশুপাঠ্য বই লিখিত, কারন সংস্কৃত মুগ্ধবাধ ব্যাকরণ আমার পড়া নাই।'
৪) অপু হৈমন্তীর প্রথম নাম রাখেন শিশির। কারন শিশিরে কান্নাহাসি একবারে এক হয়ে আছে। আর শিশির ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলায় ফুরিয়ে যায়।
৫) শিশিরের পিতা পশ্চিমের এক পাহাড়ের কান রাজার অধীনে কাজ করতেন।
৬) শিশির যখন কাল তখন তার মায়ের মৃত্যু হয়।
৭) অপুর বয়স উনিশ। তখন সে তৃতীয় বৎসর কলেজ পা দিয়েছে। তখনই তার বিবাহ হয়।
৮) অপুর শ্বশুর বা শিশিরের পিতার নাম গৌরীশঙ্কর।
৯) গৌরীশংকর শিশিরের স্বামীকে একশো টাকার একটি নোট দিয়েছিল।
১০) শিশিরের আসল নাম হৈমন্তী।
১১) গৌরীশংকর সম্বন্ধে অপুর পিতার ধারণা ছিল রাজার প্রধানমন্ত্রী গাছের একটা কিছু। কিন্তু আসল সে সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। অর্থাৎ অপুর পিতার কথানুযায়ী গৌরীশংকর আসল ইস্কুলের হেডমাস্টার।
১২) অপুর মা বলেন হৈমন্তীর বয়স এগারো। আসছে ফাল্গুনে বারোয় পা দেব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হৈমন্তীর বয়স সতেরো। কুষ্ঠীতেই এর প্রমাণ আছে।
১৩) হৈমন্তীকে অপু 'হৈম' বলে।
১৪) অপুর কথামত বনমালীবাবুই নিশ্চয় হৈমের অসুস্থতার কথা গৌরীশংকরকে জানিয়েছিল। কারন ঘটনার দিন দশেক পরেই বনমালীবাবু অপুদের গৃহ দল আসে।
১৫) হৈমন্তীর বাবা হৈমন্তীক 'বুড়ি' হল সম্বোধন করেন।
১৬) হৈমন্তীর বাবা হৈমন্তীর জন্য একজন ভালো ডাক্তার এনে হৈমন্তীর স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাল ডাক্তার বলেন হৈমন্তীর জন্য বায়ুপরিবর্তন আবশ্যক। নইলে শক্ত ব্যামো হতে পারে।

teachinns Text with Technology

উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি

১) 'যে তাম্রশাসন তাহার নাম খোদাই করা আছে সেটা আমার হৃদয়পটে।' -- তাহার = হৈমন্তী, আমার = অপু।
২) 'মায়ের বয়স বড়ো বলিয়াই পনের অঙ্কটাও বড়ো' -- 'হৈমন্তী' গল্পর অর্ন্তগত।
৩) 'শিশিরের বয়স যথাসময়ে ষোলা হইল, কিন্তু সেটা স্বভাবের ষোলা, সমাজের ষোল নহে।' ---'হৈমন্তী' গল্পের অন্তর্গত।
৪) 'আমার সই উনিশ বছরের বয়সটি আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া থাকে।'---আমার = অপু।
৫) 'যে ধন দিলাম, তাহার মূল্য যেন বুঝিতে পারে।'--বক্তা - গৌরীশংকর, ধন = হৈমন্তী।
৬) 'যাহা দিলাম তাহা উজাড় করিয়াই দিলাম। একেন ফিরিয়া তাকাইতে গেল দুঃখ পাইতে হইবে। অধিকার ছাড়িয়া দিয়া অধিকার রাখিত যাইবার মতো এমন বিড়ম্বনা আর নাই' - বক্তা - গৌরীশংকর।
৭) 'আমি তামার সত্য কখনও আঘাত করিব না । আমি যে তোমার সত্যের বাঁধনে বাঁধা' - আমি = অপু। আমার = হৈমন্তী।
৮) 'তাহাকে আমি সব দিতে পারি কিন্তু মুক্তি দিতে পারি নাই' - তাহাকে = হৈমন্তী, আমি = অপু।
৯) 'যদি লোকধর্মের কাছে সত্যধর্মকে না ঠেলিব, যদি ঘরের কাছে ঘরের মানুষকে বলি দিতে না পারিব, তবে আমার রক্তের মধ্যে বহুযুগের যে শিক্ষা তাহা কী করিতে আছ' - 'হৈমন্তী' গল্পের অন্তর্গত।
১০) 'বুকের রক্ত দিয়া আমাকে যে একদিন দ্বিতীয় সীতা বিসর্জনের কাহিনি লিখিতে হইবে, সে কথা কে জানিত।' - দ্বিতীয় সীতা = হৈমন্তী।

ল্যাবরেটরি

ল্যাবরেটরি গল্পের মেরুদন্ড মোহিনী চরিত্র, রবীন্দ্রনাথের এক বিচিত্র সৃষ্টি। গল্পটি প্রথমে 'শনিবারের চিঠি' ফাল্গুন (১৩৪৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় (১৫-ই আশ্বিণ) প্রকাশিত হয়। 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'ল্যাবরেটরি' গল্প দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাত নন্দকিশোরের মৃত্যু হল তার অনুব্রতা সাহিনী ল্যাবরেটরিকেই তার 'পূজার দেবতা' এবং ল্যাবরেটরির টাকাকে সে 'দেবতার ভান্ডার' বলে মনে করে। তাই স্বামীর বিজ্ঞানসাধনার প্রয়াসকে বাঁচিয়ে রাখতে সে প্রানপন প্রয়াস পায়। সোহিনী তরুন বিজ্ঞানী রবতীক ল্যাবরেটরির যোগ্য পরিচালক রূপ মনোনীত করে। সাহিনী ল্যাবরেটরির জন্য তার নারীত্বকে অনাসক্তভাবে ব্যবহার করে অধ্যাপককে বশ রাখতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু তার কন্যা নীলা সোহিনীর বিপরীতে ল্যাবরেটরিকে ধ্বংস করতে উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবকে কাজে লাগিয়েছে। রেবতীর বিজ্ঞানসাধনায় সে হয়ে উঠেছে মূর্তিমতী প্রতিবাদ। সস্তা প্রলোভনে নীলা রেবতীকে ভুলিয়ছে। যুবতীর যূপকাষ্ঠে গলা বাড়িয়ে বসে থাকা পুরুষ রেবতীকে নীলা সহজেই চিনেছিল। সোহিনী চিনতে পারেনি। কিন্তু দুজনেরই যা অচেনা ছিল, তা হল রেবতীর বৈজ্ঞানিক সাধনার যতখানি বিকাশ ঘটেছে, মনের বিকাশ তত ঘটেনি। তার মনুষ্যত্বের শৈশব ঘোচেনি বলেই তার জীবনে পিসিমার প্রভাব অস্তিত্বের শিকড়ের মতো চারিয়ে গিয়েছিল, তাকে সে উৎপাটন করতে পারেনি। পিসিমার এক ডাকে ঐ শিকড়ের আকর্ষন অনুভব করে এবং 'রবি চলে আয়' আহ্বান সুড় সুড় করে বেরিয়ে যায়। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কাহিনির চমকপ্রদ পরিসমাপ্তি ঘটছে।

তথ্যচুম্বক

১) নন্দকিশোর ছিলেন লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করা ইঞ্জিনিয়ার। রেলওয়ে কোম্পানির দুটো বড়ো ব্রিজ তৈরি করার কাজের মধ্যে উনি ঢুকে পড়তে পেরেছিলেন। তাঁর পদবি মল্লিক।

২) নন্দকিশোর থাকতেন শিকদার পাড়া গলির একটা দোতলা বাড়িতে।

৩) নন্দকিশোর যে মেয়েটিকে একটি আংটি পরিয়ে দিয়েছিল, তার নাম সোহিনী । পশ্চিমি ছাঁদের সুকঠোর এবং সুন্দর তার চেহারা।

৪) নন্দকিশোর-সোহিনীর একটি মেয়ে আছে। নাম নীলিমা। মেয়েটি স্বয়ং সেটিকে বদল করে নিয়েছে নীলা। মেয়েটি একবারে ফুটফুটে গৌরবর্ন। ওদের পূর্বপুরুষ কাশ্মীর থেকে এসেছিল। মেয়েটির দেহ ফুটছে কাশ্মীরি শ্বেতপদ্মের আভা। মন্মথ চৌধুরী রেবতীর প্রথম দিককার অধ্যাপক। রেবতীকে জন্ম দিয়েই ওর মা মারা যান। বরাবর রেবতী পিসির হাতে মানুষ। ওর পিসির আচরনিষ্ঠা একবারে নিরেট। রেবতী যখন সরকারের বৃত্তি নিয়ে কেমব্রিজ যাবে স্থির করে, তখন পিসিমা ভেবেছিল রেবতী চলেছে মেমসাহেবকে বিয়ে করতে। সোহিনী তার মেয়েকে নিয়ে রেবতীর সঙ্গে দেখা করার জন্য মোটর লঞ্চ করে উপস্থিত হয় বোটানিকাল। সোহিনী তখন তার মেয়েকে পরিয়েছে নীলচে সবুজ বেনারসি শাড়ি, ভিতর থেকে দেখা যায় বাসন্তী রঙের কাঁচুলি। কপাল তার কুঙ্কমর ফাঁটা। সূক্ষ্ম একটু কাজলের রেখা চোখ। কাঁধের কাছে ঝুলপড়া গুচ্ছকরা খোঁপা। পায়ে কালা চামড়ার উপর লাল মখমলর কাজ করা স্যান্ডেল। আকাশনিম - বীথিকার তলায় রবতী রবিবার যেখানে কাটায় সেখান সোহিনী এসে তাকে ধরে। নীলাকে তখন সোহিনী বসিয়া রেখেছিল স্টিমলঞ্চে। রেবতী ম্যাগ্‌নটিজম্ নিয়ে কাজ করছেন। নন্দকিশোর ক্রনামিটারটি আনেন জার্মান থেকে।

৫) রেবতীকে নীলা বলে খুদে স্যার আইজাক নিউটন।

৬) নীলা রেবতীক জাগানী ক্লাবের প্রেসিডেন্ট করার জন্য একটা সই চাই । ব্রজেন্দ্রবাবু এই ক্লাবের পট্রন। মেট্রোপলিটন ব্যাঙ্কের তিনি ডাইরক্টর।

৭) রেবতী নীলার আমন্ত্রণ চায়ের সভায় চারটে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে গিয়া হাজির হয়। ফ্যাশনেবল সাজত্তের দখলে নেই। পরে এসছে জামা আর ধুতি। কাঁধে ঝুলছে একটা পাট করা চাদর। সভা বসেছিল বাগানে। নীলার কথা মত ডক্টর ভাচার্যের দাষ উনি আসল কথাটা জোর করে বলতে পারেন না ।

৮) রেবতী ভট্টাচার্যের নিমন্ত্রণ সান্ধ্যভোজ হয় নামজাদা রেস্তোরাঁয় । সেখান টাস্ট প্রোপোজ করতে উঠছে বঙ্কুবিহারী ।

গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধৃতি

১) ওঁর নিজের কাজে কর্তারা ওকে জীনিয়াস বলত, নিখুঁদ হিসাবের মাথা ছিল তাঁর। বাঙালি বলেই তাঁর উপযুক্ত পারিশ্রমিক জোটেনি।' - তাঁর = নন্দকিশোর ।

২) 'এক রকমের শখ মানুষকে পেয়ে বসে সেটা মাতলামির মতো' --- 'ল্যাবরেটরি' গল্পের অংশ।

৩) 'আমার জন্মস্থান শয়তানের দৃষ্টি আছে, - আমার = সোহিনীর

৪) 'অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়ছি । কিন্তু আমার উপরও টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম' - আমি / আমার = সোহিনী ।

৫) ‘গরজটা যারই হোক, বন্ধুত্বটাই তা লাভ’। - ‘ল্যাবরেটরি’ গল্পের অংশ।
৬) ‘তুমি সেই ছদ্মবেশী সোনার ঢেলা’ - তুমি = সোহিনী ।
৭) ‘বোধ হয় মেয়েজাতটার পরই আপনার বিশেষ একটু কৃপা আছে’। - অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরী।
৮) ‘আমার মেয়েরা দেখবার - ছোঁবার মতো জিনিস না পেলে পুজা করবার থই পাইন’। -‘ল্যাবরেটরি’ গল্পের অংশ।
৯) ‘গায়ে আমার দাগ লেগেছ কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি’। -‘ল্যাবরেটরি’ গল্পের অংশ।
১০) ‘সত্যি কথা বলিয়ে নেবার লোক থাকলে বলা সহজ হয়’। -‘ল্যাবরেটরি গল্পের অংশ।
১১) ‘এ হচ্ছে মরা কাঠে কাঠঠোকরার ঠোকর দওয়া’। -‘ল্যাবরেটরি’ গল্পের অংশ।
১২) ‘মনে রাখিস মস্ত প্রতিভার মস্ত দায়িত্ব’। - অধ্যাপক চৌধুরি > রেবতী ।
১৩) ‘আমি বাঙ্গালির মেয়ে নই, ভালাবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করি নে। ভালাবাসার জন্য প্রাণ দিতে পারি, প্রান নিতে পারি’। - আমি = সাহিনী।
১৪) ‘ভয় কেন করব, শ্রদ্ধা করি’। - সোহিনীকে রেবতী ।
১৫) ‘নারীহরন, পানিগ্রহনের চেয়ে ভালো’। বক্তা = সোহিনী।
১৬) ‘বোকা পুরুষদের নাকে দড়ি দিয়ে চালিয়ে নিয়ে বেড়ানা সহজ’। -বক্তা = অধ্যাপক চৌধুরি।

teachinns Text with Technology

Sub Unit - 4
নাটক

৪.১ আচলায়তন

[১৯১২ - শিলাইদহে লেখা] 'রাজা' নাটক লেখার সাত আট মাস পরে 'আচলায়তন' রচিত হয় ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমবার বিলাতে গিয়ে সেখানকার গৃহসংসার পরিমন্ডলে গান ও অভিনয় আনন্দচর্চার আস্বাদ পেয়ে স্বদেশে ফিরে এসে নিজেদের পরিবারে সেই আনন্দ-পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করলেন। এই সূত্রেই তাঁর রীতিমত নাটক রচনার প্রয়াস। পারিবারিক পরিবেশে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই 'বাল্মীকি -- প্রতিভা'র রচনা। (প্রকাশকাল --- ফাল্গুন ১২৮৭) বন্ধন অসহিষ্ণু, মুক্তিপ্রয়াসী রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বের নির্দিষ্ট নাটকের সবধরণের রীতি ও নিয়ম আতিক্রম করে নাট্য রচনা শুরু করেছিলেন। রবীন্দ্র প্রতিভা প্রধানত কাব্যধর্মী। 'খেয়া' যুগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি যে নাটকগুলি লিখেছিলেন সেগুলির মধ্যে গীতিকাব্যের প্রভাব পরিস্ফুট। 'খেয়ার' পর থেকে গীতাঞ্জলি'র যুগ থেকে কবি মন রূপ থেকে অরূপের রাজ্যে, বিশ্ব থেকে বিশ্বাতীতের পথে অগ্রসর হল। তখন থেকে রূপক তত্ত্বময় নাটকগুলির সূচনা হয়েছে। আমাদের আলোচ্য 'অচলায়তন' (১৯৯৮) নাটকটি রূপক ও সাঙ্কেতিক পর্যায়ের নাটকের অর্ন্তগত। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সাঙ্কেতিক নাটক বাংলা সাহিত্যে ছিল না তার পরেও এই নাটক আর লেখা হয়নি। এই নাট্যরীতি তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেছিলেন এমন অনুমান অসঙ্গত নহে।

'অচলায়তন' নাটকের বিষয়বস্তু এইরকম :- অচলায়তন নামের একটি আশ্রমে কতকগুলি শিক্ষার্থী এবং আচার্য, উপাচার্য, উপাধ্যায়, অধ্যাপক মহা পঞ্চক প্রভৃতি বাস করে। উঁচু প্রচীর দিয়ে আশ্রমটি ঘেরা - ভেতরে লোহার দরজা। কোনো বাইরের লোকের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। এখানকার ছাত্ররা কেবল নানা মন্ত্র মুখস্থ করে, তন্ত্রঅনুসারে বিভিন্ন ক্রিয়াকান্ড করে, শাস্ত্রের বচন অনুসারে জীবন যাপন করে। সামান্য একটু নিয়ম লঙ্ঘনে মহাপাতকের ভয়। ছাত্র ও অধ্যাপকের জীবন এখানে কঠিন নিয়ম ও নিষ্ঠার বাঁধনে দৃঢ়ভাবে বাঁধা। অতি প্রচীন এই প্রতিষ্ঠান। ছাত্রদের মধ্যে পঞ্চম নামে একটি ছাত্র ছিল, সে প্রানের সঙ্গে এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না। সে মন্ত্র মুখস্থ করতে পারে না, এই আশ্রমে জীবনে সে কোনো আনন্দ পায় না। তার কথায় ও ব্যবহারে সর্বদা অনিয়ম ও বিদ্রোহ।

এই অচলায়তনের উত্তর দিকে আছে একজটা দেবীর মন্দির। সেই মন্দিরের দিকের জানালা খোলা নিষেধ। আশ্রমের এক বালক শিক্ষার্থী সুভদ্র কৌতূহলবশত সেই জানালা খুলেছে। তাই আশ্রমের মধ্যে নিয়মভাঙ্গার হৈ-চৈ পড়ে গেছে। সুভদ্রর পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে তাই নিয়ে সবাই ব্যস্ত। কিন্তু পঞ্চক বলে এতে কোনো পাপ নেই। সে সুভদ্র কে আশ্বাস দেয়। এই আয়তনের সর্বাধ্যক্ষ আচার্য বহুকাল থেকে ক্রিয়াকান্ড, তন্ত্রমন্ত্র নিয়ে ব্যাপৃত আছেন, কিন্তু এই নিরবিচ্ছিন্ন ব্রত, উপবাস, প্রায়শ্চিত্ত মন্ত্রাভাসে তিনি অন্তরে কোনো আনন্দ ও শান্তি পাচ্ছেন না। তিনি ছাড়তেও পারছেন না অথচ একে সত্য বলে গ্রহন করতে পারছেন না। সুভদ্রর প্রায়শ্চিত্তর ব্যাপারে আচার্য্য বিধান দিলেন সুভদ্রকে আশীবাদেই তার মঙ্গল হবে। মহাপাতকের দলের মনে হল আচার্য সনাতন ধর্ম বিনাশ করছেন তাই আচার্য ও পঞ্চককে নির্বাসন দেওয়া হল। তারা দুজনে দর্ভক পল্লীতে আশ্রয় নিল।

অচলায়তনের বাইরে শোন পাংশুদের বাস ও প্রাচীরের এককোনে দর্ভকপল্লী উভয়ে অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ। শোন পাংশুরা কর্ম-পাগল, দাদা ঠাকুরকে নিয়ে তারা মাতামাতি করে। আবার দাদাঠাকুর দর্ভকদের গোঁসাই তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র। বহুদিন থেকে আচলায়তনে গুরুর আসার কথা। এমনসময় দাদাঠাকুরই গুরুরূপে আর্বিভূত হলেন। সঙ্গে তাঁর অস্ত্রধারী শোন পাংশুর দল। বহুদিনের উঁচু প্রাচীর গুরুর আদেশে ভেঙ্গে ফেলা হল। আকাশের অর্পযাপ্ত আলো বাতাস এসে অচলায়তনে প্রবেশ করল। গুরু নতুন ভাবে অচলায়তনের পুর্নগঠন করলেন। তিনি পঞ্চককে নির্বাসন থেকে ডেকে আনলেন। মহাপঞ্চককে ও বাদ দিলেন না। মহাপঞ্চক ও পঞ্চকের হাতেই অচলায়তনকে নতুন করে গড়ার ভার দিলেন। এইভাবে অচলায়তনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির যোগে আনন্দ নিকেতনে পরিণত হল। এই নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্যও প্রণিধানযোগ্য ---

'' আমাদের পাপ আছে বলিয়াই শাস্তি আছে --- যত লড়াই ওই শাস্তির সঙ্গে, আর যত মমতা ওই পাপের প্রতি। আমার পক্ষে প্রতিদিন ইহা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী এই বন্দিশালাকে একদিন আমিও নানা মিষ্ট নাম দিয়া ভালোবাসিতে চেষ্ট করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে অন্তরাত্মা তৃপ্তি পায় নাই । অচলায়তনে অমার সেই বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বেদনা নয়, আশাও আছে''। [রবীন্দ্র রচনাবলী -- ১১শ খন্ড পৃঃ ৫০৬ -৫১০]

গুরুত্বপূর্ন তথ্য

- ‘অচলায়তন’ নাটকের দৃশ্যসংখ্যা ৬টি।
  - প্রথম দৃশ্য -- অচলায়তনের গৃহ
  - দ্বিতীয় দৃশ্য -- পাহাড় মাঠ
  - তৃতীয় দৃশ্য -- অচলায়তন
  - চতুর্থ দৃশ্য -- দর্ভকপল্লী
  - পঞ্চম দৃশ্য -- অচলায়তন
  - ষষ্ঠ দৃশ্য -- দর্ভকপল্লী
- ‘অচলায়তনে’ নাটকটির উৎসর্গপত্র রচনা করেন শিলাইদহে বসে ১৫ আষাঢ় ১৩১৮ সালে । উৎসর্গপত্রটি নিম্নরূপ : আন্তরিক শ্রদ্ধার নির্দশন -স্বরূপ এই অচলায়তন নাটকখানি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিলাম । পত্রিকায় প্রকাশকালে এই উৎসর্গপত্রটি রচিত হয় কিন্তু গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে এই উৎসর্গপত্রটি বর্জিত হয়।
- নাটকের গানের সংখ্যা -- ২৩টি
- ‘অচলায়তন’ নাটকের চরিত্রগুলি হল : পঞ্চক , মহাপঞ্চক, সুভদ্র, ছাত্রদল -- বিশ্বম্ভর, সঞ্জীব, জয়োত্তম, বালকদল তৃণাঞ্জন, উপাধ্যায়, আচার্য, উপাচার্য, শোনপাংশুর দল, দাদাঠাকুর, রাজা, পদাতিক, দর্ভকদল।
- অচলায়তন নাটক সম্পর্কে লেখকের নিজের ও সমালোচকদের মতামত।
  - ‘‘ধর্ম যখন আচারকে নিয়মকে শাসনকে আশ্রয় করে কঠিন হয়ে ওঠে তখন সে মানুষকে বিভক্ত করে দেয় ... ধর্মে যখন রসের বর্ষা নামে তখন ... সেই পূর্ণতায় সকলকে মিলিয়ে দিতে চায়’’। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
  - ‘‘. . .নাটকের বিষয়বস্তু ছাড়াও কবি মনের পশ্চাদ্‌ভাগের একটি ধারনা বা চিন্তা এই নাটকের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় । তাহা কবির ইতিহাস চেতনা বা সমাজসমস্যা চেতনার রূপ ’’। (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)
  - ‘অচলায়তন’ নাট্যে কবি প্রাচীন সভ্যতার সঙ্কীর্নতার যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা অতিশয় সুন্দর হইয়াছে । এই নাট্যের নামকরন ইহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ’’। (সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত)
  - ‘‘অচলায়তনের কাহিনীতে রূপক ও রূপকথা জড়াইয়া আছে। ইতিহাসের কোনো ঘটনার ও ব্যাক্তির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। বৌদ্ধ -অবৌদ্ধ কোন পুরাণকাহিনী অথবা প্রচীন আধুনিক কোন গল্প অবলম্বনে নাটককাহিনী পরিকল্পিত নয়’’। রবীন্দ্রনাথ ‘অচলায়তন’ এর পঞ্চক ও মহাপঞ্চক নাম দুটি এবং কাহিনীর যৎসামান্য সূত্র সম্ভবত পেয়েছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত (‘The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, গ্রন্থের story of panchak’) থেকে।
- নাটকটি পঞ্চকের ‘তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে’ গান দিয়ে শুরু।
- পঞ্চকের সংলাপ দিয়েই নাটকটি শেষ হয়েছে।
- সুভদ্র অচলায়তনের উত্তর দিকের জানালা খুলে বাইরটা দেখে ফেলেছিল। এই জানালা তিনশো পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে বন্ধ ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম নাটক বাল্মীকি প্রতিভা’ (১৮৮১)।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম যথার্থ সাংকেতিক নাটক রাজা (১৯১০)।
- রবীন্দ্রনাথ ‘অচলায়তন’ নাটকটি নাম হিসেবে ‘গুরু’ নামটিকে পছন্দ করেছিলেন এর প্রমাণ মেলে চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের লেখায় :
  ‘‘প্রথমে যেদিন অচলায়তন নাটক পাঠ করেন, সেদিনই উহার নাম গুরু রাখিবার ইচ্ছা কবি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অচলায়তন নামটিকেই অধিক সমর্থন করাতে তাহাই বহাল থাকিয়াছিল’’।
- ‘অচলায়তন’ প্রকাশের ছয় বৎসর পরে ১৩২৪ বঙ্গাব্দের শেষ দিকে সহজ অভিনয় যোগ্য করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ নাটকটির কিছু পরিবর্তন ও বর্জন করে ‘গুরু’ শিরোনামে রূপান্তরিত করেন । এর ভূমিকায় তিনি লেখেন -
  ‘‘সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি ‘গুরু’ নামে এবং কিঞ্চিৎ রুপান্তরিত এবং লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল’’।

4.2 মুক্তধারা [প্রকাশকাল - ১৯২২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবাত্মার বন্ধন মুক্তির আদর্শে বিশ্বাসী। পরিপূর্ণ মানবত্মার পূজারী তিনি। যেখানে ধর্মের শুষ্ক আচার ও মিথ্যা ভয় দ্বারা মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়েছে, সমাজের যুক্তিহীন, হৃদয়হীন রীতি নীতি দ্বারা মানাবত্মা পীড়িত সেখানেই কবির মনোগত আদর্শ ক্ষুন্ন হয়েছে। ১৯১৮ সাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হয়। মহাযুদ্ধের সংবাদে কবি চিত্ত খানিকটা আলোড়িত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল 'ক্রন্দনের কলরোল' ও 'লক্ষ বক্ষ হইতে মুক্ত রক্তের কল্লোল' এর মধ্য দিয়ে দেখা দেবে নূতন উষার স্বর্ণদ্বার'। কিন্তু কবির আশা ব্যর্থ হল। যুদ্ধোত্তর জগতে নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলল না মৃত্যুসিন্ধুমন্থনে মানুষের ভাগ্যে অমৃত উঠল না 'মুক্তধারা' ও পরবর্তী নাটক 'রক্তকরবীতে এই যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও আমেরিকাই রবীন্দ্রনাথের মানস পটভূমি।

'প্রবাসী' পত্রিকায় (বৈশাখ- ১৩২৯) 'মুক্তধারা' (১৯১২) নাটকটি প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখাকে ভেঙে গড়ে বারবার নতুন রূপে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রেও নাটকের পূর্বসূত্র 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকেও অনুভব করা যায়। নাটকটিকে প্রথমে তিনি 'পথ' নামে অভিহিত করেছিলেন। এই পথ জীবনের নিরন্তর অগ্রসর হওয়া ---- অবিরাম চলার প্রতীক। রানু অধিকারীকে একটি পত্রে (৪ মাঘ, ১৩২৮) তিনি লিখেছিলেন।---

''আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখেছিলুম --- শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আমার ছুটি এ নাটকটি প্রায়শ্চিত্ত নয়, এর নাম 'পথ'। এতে কেবল 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী আছে , আর কেউ নেই'', - শুধু চরিত্র নয়, ভাবনায় ও উপস্থাপনায় মুক্তধারা একটি অভিনব নাট্যপ্রয়াস।

মুক্তধারা নাটকে উগ্রজাতীয়তাবাদ, পররাজ্য লোলুপ রাষ্ট্রনীতি এবং যন্ত্রসভ্যতার আস্ফালন নগ্নভাবে ফুটে উঠেছে। শুধু ভারতবর্ষ নয় ইউরোপ-এশিয়া-আমেরিকার মানুষেরও মররনবাঁচনের সমস্যার শুভ সমাধানের সংকেত নাটকটিতে আছে। মানুষের সংকীর্ণ জাতিগত স্বার্থচেতনা ও বণিকবৃত্তি পৃথিবীর বুকে যে পীড়ন চালিয়েছে, তার বিরূদ্ধে মানুষের শুভবুদ্ধি ও কল্যান প্রেরণা একদিন জাগ্রত ও জয়ী হবে। মানুষ যন্ত্রের দাস না হয়ে যন্ত্র মানুষের দাস হবে - এটা-ই মুক্তধারা নাটকের মর্মকথা।

মুক্তধারার বিষয়বস্তু এইরূপ:-

উত্তরকূটের রাজা রনজিৎ বিজিত অথচ বিদ্রোহী শিবতরাই জনপদের প্রজাদের আয়ত্তে আনতে না পেরে রাজ্যের জলসরবরাহের পথ বন্ধ করে দিয়েছেন।মুক্তধারা ঝরনা এতকাল তাদের পিপাসিত কণ্ঠ ও চাষের ক্ষেত সরস করে রেখেছিল, কিন্তু যন্ত্ররাজ বিভূতি বহুবৎসরে চেষ্টায় এক বিরাটাকায় লৌহযন্ত্রের বাঁধ নির্মাণ করে সেই মুক্তধারাকে বেঁধে ফেলেছে। শিবতরাই এর পিপাসা ও চাষের জল চিরতরে রূদ্ধ হয়েছে।

শিবতরাই এর প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে দু বছর খাজনা বন্ধ করে দিয়েছে। দেশে দূর্ভিক্ষ হওয়ায় তারা কোনো মতে খাবার অন্ন জোগাড় করেছে। উদ্বৃত্ত না হওয়ায় খাজনা দিতে পারছে না। মন্ত্রীর পরামর্শে রাজা যুবরাজ অভিজিৎকে দায়িত্ব দিয়েছিল প্রজাদের বশে আনার জন্য। কিন্তু অভিজিৎ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। সে চিরদিনের মতো শিবতরাই এর বাসিন্দাদের উত্তরকূটের অন্নজীবী হয়ে থাকার দূর্গতি থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। তার জন্য যুবরাজ বহুকালের রুদ্ধ নান্দিসংকটের পথ কেটে দিয়েছেন। যে পথ দিয়ে শিবতরাই এর পশম বিদেশের বাজারে বিক্রি হয়ে অর্থসমস্যার সমাধান করতে পারে। যুবরাজের এই কাজে উত্তরকূটের স্বার্থান্বেষী প্রজারা ক্ষেপে উঠেছে। যুবরাজ অভিজিৎকে রাজা সরিয়ে দিলেন। তবুও ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে উগ্র প্রজারা খাজনা না দিতে বদ্ধপরিকর রইল। এই বিদ্রোহী প্রজাদের বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য মুক্তধারার বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। এই বাঁধ বাঁধিবার জন্য অর্থব্যয় ও প্রাণব্যয় করে যন্ত্র নির্মাণ করা হয়েছে। বিরাট দৈত্যের মতো যন্ত্র সগর্বে আকাশে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

পরিশেষে অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি - পথে অবিশ্রাম লোকের আনাগোনা। এমন সময় মুক্তধারার জলস্রোতের শব্দ শোনা গেল-যেন 'অন্ধকারের বুকের ভিতর খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল' সকলেই বুঝল মুক্তধারার বাঁধ ভেঙেছে - মুক্তধারা ছুটছে। সুতরাং মানব জীবনের অব্যাহত, স্বচ্ছন্দ, অবিরাম গতিই মুক্তধারা। এই রুদ্ধ অবস্থা জীবনের বিকৃত ও অসত্য রূপ, সর্ববন্ধনমুক্ত গতিই জীবনের স্বরূপ, মুক্তধারাই তার জীবনের প্রতীক। প্রকৃতির উপর অত্যাচার করলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেয়। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি ও যন্ত্র যদি মনুষ্যত্বের অনুকূল না হয় তবে তার ধ্বংসই কাম্য। রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা নাটকে এই কাম্যতাকেই শিল্পরূপ দান করেছেন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- ‘মুক্তধারা’ নাটকটি ‘ব্রাহ্মমিশন প্রেস’ থেকে প্রবাসী কার্যালয়ের পক্ষে ১৪-ই আষাঢ় ১৩২৯ বঙ্গাব্দ (২৮-শে জুন ১৯২২) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় নাটকটি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন।
- ‘মুক্তধারা’ নাটকটি রচনার সময় রবীন্দ্রনাথ নাটকটির নাম দিয়েছিলেন ‘পথ’।
- ‘‘এই নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ ‘প্রায়শ্চিত্ত’ নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া।’’ [‘মুক্তধারার ভূমিকা / রবীন্দ্রনাথ / বৈশাখ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ]
- সমগ্র ‘মুক্তধারা’ নাটকটি পথে সংঘটিত হয়েছে।
- এই নাটকের কোন অঙ্ক এক দৃশ্য বিভাজন নেই ।
- ‘মুক্তধারা’ নাটকে মোট সংগীত রয়েছে চোদ্দটি এর মধ্যে আবার ধনঞ্জয় বৈরাগীর গান আর একটি জনসাধারণের এবং ভৈরব পন্থীদের গান রয়েছে একটি - যা আংশিক বা সমগ্রভাবে মোট আটবার গীত হয়েছে।
- ‘মুক্তধারা’ নাটকের কবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল ‘The Morden Review’ পত্রিকার মে ১৯২২ সংখ্যায় ।
- রবীন্দ্রনাথ ‘মুক্তধারা’ নাটকটি লেখা শেষ করেছিলেন - শান্তিনিকেতন ১৩২৮ বঙ্গাব্দের পৌষ সংক্রান্তিতে।
- অম্বা হল সুমনের মা। এই সুমন মুক্তধারার বাঁধ বাঁধতে গিয়ে মারা গেছে।এদের গাঁয়ের নাম জনাই।
- নাটকটি শুরু হয়েছে ভৈরব পন্থী সন্ন্যাসীদের গানে -‘জয় ভৈরব, জয় শঙ্কর / জয় জয় প্রলয়ঙ্কর / শঙ্কর শঙ্কর দিয়ে/
- ‘নমোযন্ত্র, নমোযন্ত্র’ গানটি গেয়েছিলেন উত্তরকূটের নাগরিকরা।
- উত্তরকূটের সেনাপতির নাম - বিজয়পাল
- রাজা রনজিতের শ্যালক হলেন - চন্ডপাল।
- শিবতরাইয়ের জনতার সর্দারের নাম - গণেশ।
- ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সবসময় বড় পথ দিয়ে চলাচল করেন না । উক্তটি হল অভিজিতের দূতের
- ‘নমোযন্ত্র, নমোযন্ত্র’ গানটি গেয়েছিলেন উত্তরকূটের নাগরিকরা।
- ‘প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে’ - উক্তিটি করেছিলেন রাজা রনজিৎ।
- ‘ও বললে, এই জলের শব্দে আমি আমার মাতৃভাষা শুনতে পাই’ -উক্তিটি রাজা রনজিতের
- ‘আমি পৃথিবীতে এসেছি পথ কাটবার জন্যে, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেছে’ - উক্তিটি যুবরাজ অভিজিতের
- ‘প্রাণের বদলে প্রাণ যদি না মেলে, মৃত্যু দিয়ে যদি মৃত্যুকেই ডাকা হয়, তবে ভৈরব এত বড়ো ক্ষতি সইবেন কেন?’
  - উক্তিটি বটুকের
- ‘যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে’। - অভিজিতের উদ্দেশ্যে সঞ্জয় বলেছে ।

Sub Unit- 5
প্রবন্ধ

মেঘদূত, ছেলেভুলানো ছড়া -১, বঙ্কিমচন্দ্র, সাহিত্যের তাৎপর্য, তথ্য ও সত্য, বাস্তব, সাহিত্যে নবত্ব, আধুনিক কাব্য, মনুষ্য, নরনারী পল্লীপ্রকৃতি -১

রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি প্রধানত রোমান্টিক কবি - এই পরিচয়ের মাধ্যমে সারা বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেছেন । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি প্রতিভা কেবলমাত্র কাব্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। উপন্যাস, ছোটগল্প নাটক এবং প্রহসন, সংগীত এবং আমাদের আলোচনার বিষয় প্রবন্ধের দিকটিকেও সমৃদ্ধ করেছেন। প্রবন্ধ সম্পর্কে ড: সুকুমার সেন তার 'বাঙ্গালী সাহিত্যের ইতিহাস' (৪-র্থ খন্ডে) বলেছেন - ''বাস্তব অবাস্তব যে কোন বিষয়ে উপস্থাপিত আলোচনার সীমিতভাবে পর্যালোচনা বা বিচার। এই শাখার নাম প্রবন্ধ।''

বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ নামটি প্রথম ব্যবহার করেছেন কবি-ঐতিহাসিক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬২ অব্দে তাঁর লেখা গ্রন্থে - ''বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধে''। তারপর পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে' (১৮৮৭)। রবীন্দ্র-প্রবন্ধ প্রচলিত বাংলা প্রবন্ধ ধারা থেকে সম্পূর্ন পৃথক ও স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি প্রধানত 'ভারতী', 'সাধনা' 'বঙ্গদর্শন' ও সবুজপত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

মেঘদূত

'মেঘদূত' প্রবন্ধটি প্রথমে (১২৯৮, অগ্রহায়ণ) 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ১৯০৭ সালের ১৩ জুলাই 'প্রাচীন সাহিত্যে' গ্রন্থের অর্ন্তগত হয়ে প্রবন্ধ রূপে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত কাব্যকে উপলক্ষ্য করে প্রাচীন ভারতবর্ষের ও মাধুর্যের পরিচয় অতি নৈপুন্যসহকারে পরিবেশন করেছেন। 'মেঘদূত' নামে 'মানসী' ও 'চৈতালি' কাব্যে কবিতা আছে। বিরহী যক্ষ রামগিরি থেকে হিমালয় পর্যন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষের যে অংশ সেখান থেকে বর্ষাকালে নির্বাসিত হয়েছেন। মন্দাক্রান্তা ছন্দে সেখানে যে জীবনস্রোত প্রবাহিত হয় তা যেন একটি বিশেষ ব্যক্তির বা কালের নয়। বিপুল সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যপূর্ন শিপ্রা তীরবর্তী উজ্জয়িনী নগরীও আজ লোপ পয়েছে। যক্ষ প্রিয়ার সান্নিধ্যে একদা অখন্ড সৌন্দর্যলোকর বিচরন করতেন কিন্তু যক্ষের নির্বাসন সেই সৌন্দর্যলোক থেকে তার বিচ্যুতি। কোনো এক ইংরেজ কবির মতে 'মানুষেরা এক - একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, তাদের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবনাক্ত সমুদ্র।'' এই ব্যাবধান কেবল কালের নয়, বর্তমান ও অতীতের নয়, প্রতিটি মানুষের মধ্যে সীমাহীন বিরহের পরিধি। কিন্তু একথাও মনে কোনো এক কালে আমরা এক মানসলোকে ছিলাম, যেখানে কাব্যের কল্পনার, অভিশাপে নির্বাসিত হয়েছি। তাই বৈষ্ণব কবি বলেন ''তোমার হিয়ার ভিতর হইতে কে কৈল বাহির।'' তাই আমাদের পরস্পরের সঙ্গে মিলনের চেষ্টা - থাকলেও, মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী। সেই নির্জন গিরিশিখরে বিরহী ভাবছে শরৎ পূর্নিমা রাত্রে চিরমিলন হতেও পারে। কিন্তু কবির মনে সংশয় আছে কবি ও কল্পনার মধ্যে প্রভেদ হারিয়ে যাবে।

তথ্য

১) মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের বাল্যকাল থেকে একান্ত প্রিয় গ্রন্থ।
২) ১২৯৮ তে রচিত 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত।
৩) 'মেঘদূত' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথ দুটি কবিতা রচনা করেন। প্রথমটি 'মানসী' দ্বিতীয়টি 'চৈতালি' কাব্যে সংকলিত আছে।
'লিপিকা' গ্রন্থেও 'মেঘদূত' নামে একটি কাব্য-নিবন্ধ আছে। এছাড়া আছে 'বিচিত্র' প্রবন্ধের 'নববর্ষা' প্রবন্ধে ।
৪) কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের ছন্দের নাম 'মন্দাক্রান্তা'
৫) 'প্রচীন সাহিত্যে' সাতটি প্রবন্ধ আছে 'রামায়ণ', 'মেঘদূত', জ্ঞকুমারসম্ভব ও শকুন্তলা,' 'শকুন্তলা,' 'কাদম্বরী চিত্র', 'কাব্যের উপেক্ষিতা' 'ধম্মপদং'।
৬) রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ট ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬০ খ্রী: কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর পদ্যানুবাদ করেছেন।
৭) মেঘদূতে অবন্তী, বিদিশা, উজ্জয়িনী হল নগর, বিন্ধ্য কৈলাস, পর্বত, রেবা, শিপ্রা ও বেত্রবতী হল নদী ।
৮) 'thing of beauty is a joy for ever'----- কীটস ।

গুরুত্বপূর্ণ উক্তি

ক) ''সেখান হইতে কেবল বর্ষাকাল নহে, চিরকালের মতো আমার নির্বাসিত হইয়াছি''।
খ) ''বিদিশা উজ্জয়িনী, বিন্ধ্য কৈলাস দেবগিরি, রেবা শিপ্রা বেত্রবতী। নামগুলির মধ্যে একটি শোভন সম্ভ্রম শুভ্রতা আছে।
গ) 'মানুষেরা এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো, পরস্পরের মধ্যে অপরিমেয় অশ্রুলবণাক্ত সমুদ্র''।
ঘ) ''কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ''।
ঙ) বলরাম দাস বলিতেছেন - ''তেঁই বলরামের, পহু, চিত নহে স্থির'।
চ) ''সুখ - সৌন্দর্য - ভোগ - ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা -- যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আসিতে দেয় না - আকাঙ্খার উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর''।
ছ) ''হৃদয়ের মধ্যে এক হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু মাঝখানে বৃহৎ পৃথিবী।
জ) ''এখন কবির মেঘ ছাড়া আর কাহাকেও দূত পাঠাইতে পারি না''।
ঝ) ''হে নির্জন গিরিশিখরের বিরহী, স্বপ্নে যাহাকে আলিঙ্গন করিতেছ, মেঘের মুখে যাহাকে সংবাদ পাঠাইতেছ, কে তোমাকে আশ্বাস দিল যে, এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোকে শরৎপূর্ণিমা রাত্রে তাহার সহিত চিরমিলন হইবে''।
ঞ) বৈষ্ণব কবি গেয়েছেন - 'দুঁহু কোলে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'

ছেলেভুলানো ছড়া -১

রবীন্দ্রনাথের ছেলেভুলানো ছড়া -১ প্রবন্ধটি 'সাধনা' পত্রিকায় (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১) এ 'মেয়েলি' ছড়া নামে প্রকাশিত হয়। পরে প্রবন্ধটি 'লোকসাহিত্য'(১৯০৭) গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে পদ্মাপারে বসবাসকালে তাঁর কবিত্ব শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বাংলা ভাষার ছড়া সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের প্রতি জিজ্ঞাসা ছিল, এক কবি এত সাধনার দ্বারা মহাকাব্য, খন্ডকাব্য, নীতিকাব্য রচনা করলেন, তা প্রতিদিন ব্যর্থ ও বিস্মিত হচ্ছে আবার কোন গুনে কোন অনাদী কালে অখ্যাত লোকের দ্বারা রচিত ছড়াগুলো লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হয়ে চলেছে, 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর, নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আর পাঁচজন বালক বালিকার মতো তাঁর কাছেও মোহমন্ত্রের মতো ছিল। আসলে এই না ভুলতে পারার কারন কবি নিজেই আবিষ্কার করেছেন। ছড়ার আছে একটি বিশেষ গুন - তা হল সকলের কাছে 'চিরকালীন'। চিরকালীনতা গুণেই ছড়াগুলি বহুকাল আগে রচিত হয়েও নতুন এর বিপরীতে চিরপুরাতন। মহাকাল ছড়াগুলোকে স্পর্শ করতে পারেনি। ছড়াগুলি মানব প্রকৃতির কোলে আপনি জন্মলাভ করেছে । এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল - স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘ ক্রীড়িত নভোমন্ডলের ছায়ার মতো। রবীন্দ্রনাথ ছড়াকে শিশুসাহিত্য বলে উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ একাধিক ছড়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে দেখেছেন, ছড়ার মধ্যে বিষয়ের ঐক্য নেই। ঘটনাগুলি কার্যকারণ সূত্রে অন্বিত নয়। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে কতকগুলো টুকরো গ্রহ আছে। একটা গোটা গ্রহ ভেঙে যেমন খন্ড খন্ড হয়ে যায়, ছড়াগুলিও যেন সেইরকম টুকরো টুকরো জগৎ। মেঘ যেমন বিচিত্র সব ছবি আঁকে ছড়াগুলিও আমাদের মানসপটে নানারকম ছবি এঁকে চলে। চিত্রধর্মিতা ছড়াগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই চিত্রধর্মিতার মধ্যেই আমাদের সামগ্রিক জীবনচর্যার ছবি ফুটে ওঠে।

ছড়াগুলিও শিশুর মতো স্নেহ রসে বিগলিত। শিশুদেবতার অদ্ভুত অসংগত অর্থহীন চালচিত্রে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করে মর্তলোকে দেবতার জগৎলীলা, অনুকরন, করে বঙ্গজননী যে তাঁর শিশুটির মধ্যে ননীচোরা গোপাল কৃষ্ণকে খুঁজে পান। আমাদের মনের কাছে ছড়াগুলি সংলগ্ন হওয়ামাত্র তার বিস্তৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হয়ে অশ্রুরসে সজীব হয়ে উঠেছে।

তথ্য

১) পত্রিকায় প্রকাশের সময় 'ছেলেভুলানো ছড়া' ---- ১ প্রবন্ধটির নাম ছিল 'মেয়েলি ছড়া'।
২) ছেলেভুলানো ছড়া : ১ প্রবন্ধে মোট ২৬টি স্বতন্ত্র ছড়া আছে ।
৩) 'ছেলেভুলানো ছড়া : ১ প্রবন্ধটি লোকসাহিত্যের (১৯০৭) অর্ন্তভুক্ত ।
৪) 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর - টুপুর, নদী এল বান' ------ এই ছড়াটি বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে মোহমন্ত্রের মত ছিল ।
৫) 'যুমনাবতী - সরস্বতী, কাল যমুনার বিয়ে' ----ছড়ায় যে বিষয়গুলি উঠে আসে সেগুলি হল ----- কাজিতলা, সীতারামের খেলা, আলোচাল, ত্রিপূর্ণির ঘাট, ওড়ফুল,

৬) ''গ্রাম্যতা অথবা কুরুচি দোষের জন্য কোন ছড়া বাদ না দেওয়া হয় এবং অর্থহীন শব্দ সমষ্টিকেও সামান্য জেনে না করেন। (সরলা রায়কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৭) ''------- কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারো মতান্তর হইতে পারে না। কারন, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি । (ছেলেভুলানো ছড়া - ২ - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

৮) রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের --- 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোহপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ ---------- কিং পুনরদূরসংস্থে। এই শ্লোকটি 'ওপারেতে কালো রং বৃষ্টি পড়ে ঝম ঝম ছাড়ার প্রসঙ্গে ব্যবহার করেছেন।

৯) 'জাদু -- এ তো বড় বঙ্গ জাদু , এ তো বড় রঙ্গ' ---- ছড়ায় কন্যা যথাক্রমে চার কালো, চার ধলো, চার রাঙা, চার তিতো, চার হিমের নমুনা জানাতে চেয়েছে।

ক) চার কালোর নমুনা প্রসঙ্গে বলেছেন ---- কাক, কোকিল, ফিঙ্গের বেশ। কিন্ত এগুলির অপেক্ষা কালো তোমার মাথার কেশ।

খ) চার ধলোর নমুনা হল --- বক, বস্ত্র, রাজহংস, হাতের শঙ্খ।

গ) চার রাঙার নমুনা হল --- জবা, করবী, কুসুমফুল, ও মাথার সিঁদুর।

ঘ) চার তিতোর নমুনা হল --- নিম, নিসুন্দে, মাকালফল ও বোনসতিনের ঘর।

ঙ) চার হিমের নমুনা হল --- জল, স্থল, শীতলপাটি এবং বুকের ছাতি।

১০) 'আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই' ---- ছড়াটিতে দোলায় ছ'পন কড়ি আছে।

১১) রবীন্দ্রনাথ ছেলেভুলানো ছড়াগুলিকে বলেছেন --- চিরপুরাতন।

১২) ''--------তাঁর নিজস্ব রসদৃষ্টিতে ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির কারণে ছড়াগুলি নবতর তাৎপর্য লাভ করেছে এবং পাঠক সাধারনের কাছে আপাত তুচ্ছ ছড়াগুলিও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে''। (বরুন কুমার চক্রবর্তী)

বঙ্কিমচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অন্যতম একটি প্রবাদ প্রতিম প্রবন্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্র'। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি 'সাধনা' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩০২) প্রথম প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর, তাঁর প্রতিভার প্রতি সম্মান জানিয়ে এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধটি লেখেন। শৌরীন্দ্রমোহন, ঠাকুরের 'মরকতকুঞ্জে' অনুষ্ঠিত পুনমিলন উৎসবে প্রথম দেখাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বল্পবাক্ প্রবল ব্যক্তিত্ব ও পৌরুষ, সুরুচি ও সংযম বালক রবীন্দ্রনাথকে গভীর ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বঙ্কিমই প্রথম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয়ের বিকাশ ঘটিয়েছিলেন। তাঁর প্রতিভা বলে বাংলাভাষা থেকে শৈশব থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছিল। রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট - স্তরের উপর স্থাপন করে উন্নত করার চেষ্টা করেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র তার উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢেলে পলিমৃত্তিকা স্থাপন করেছেন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যে কিছুটা শ্রী ও লাবন্যের সম্ভার করতে সক্ষম হলেও বঙ্কিমচন্দ্র তাতে 'হ্রী' সঞ্চার করে তাকে উপন্যাসের উপযোগী করে গড়ে নিয়েছিলেন। এই গড়নের কর্ষণভূমি হল 'বঙ্গদর্শন' । এই বঙ্গদর্শনের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের একটি আদর্শমান প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন ।সাহিত্যে হাস্য রসের সুমার্জিত প্রয়োগ বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম করেছেন । বঙ্কিমচন্দ্র শুচিশুভ্র নির্মল হাস্য রসের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যকে শক্তিদৃপ্ত অথচ সুকুমার সৌন্দর্যে মন্ডিত করে তুলেছেন । রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে সব্যসাচী ও ভগীরথের সঙ্গে তুলনা করে প্রবন্ধটিকে তাৎপর্যমন্ডিত করে তুলেছেন । বাংলা সাহিত্যকে একতারা যন্ত্র থেকে বীনা যন্ত্রে রূপান্তরকরণে বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারন ভূমিকা প্রবন্ধের সর্বত্র পরিস্ফুট।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ----------

''একদিন আমাদের বঙ্গভাষা কেবল একতারা যন্ত্রের মতো একতারে বাঁধা ছিল, কেবল সহজ সুরে ধর্ম - সংকীর্তন করিবার উপযোগী ছিল, বঙ্কিম স্বহস্তে তাহাকে এক একটি করিয়া তার চড়াইয়া আজ তাহাকে বীণা যন্ত্রে পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন। পূর্বে যাহাতে কেবল স্থানীয় গ্রাম্য সুর বাজিত আজ তাহা বিশ্বসভায় শুনাইবার উপযুক্ত ধ্রুপদ অঙ্গের কলাবতী রাগিণী আলাপ করিবার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে''। ভাষা ও অলংকারের পরিমিত প্রসাধনে 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে আজও একক ও রমণীয়।

তথ্য

১) ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬শে চৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভায় পাঠের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি লেখেন।

২) 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি আধুনিক সাহিত্যের অর্ন্তভুক্ত। আধুনিক সাহিত্য প্রথম প্রকাশিত হয় গদ্য গ্রন্থাবলীর শীর্ষক গ্রন্থমালার পঞ্চম গ্রন্থরূপের। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ২৩শে আশ্বিন। প্রকাশক ----- সুহাসচন্দ্র মজুমদার।

৩) 'বঙ্কিমচন্দ্র' 'প্রবন্ধটি' আধুনিক সাহিত্য প্রবন্ধগ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধ।

৪) বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধগ্রন্থের উল্লেখ আছে এই প্রবন্ধে ।

৫) সাহিত্যের মধ্যেও দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়। ধ্যান যোগী ও কর্মযোগী দেখা যায়।

৬) বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করে যাওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

৭) ঈশ্বরগুপ্ত যখন সাহিত্য গুরু তখন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বঙ্কিমও ছিলেন।

সাহিত্যের তাৎপর্য

সাহিত্যের তাৎপর্য পবন্ধটি সাহিত্য প্রবন্ধ গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত। প্রবন্ধটি প্রথমে 'বঙ্গদর্শন' 'নবপর্যায়' প্রত্রিকায় (অগ্রহায়ন - ১৩১০) প্রথম প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' কিভাবে সৃষ্টি হয় তার মূল বা শিকড়ের সন্ধান চালিয়েছেন। মানুষ যেমন হৃদয় রসে জারিত করে তার বর্হিজগৎটাকে অর্ন্তজগতে পরিনত করে, তেমনি হৃদয়ের এই জগৎ সর্বদা নিজেকে প্রকাশ করার জন্য ব্যাকুল। সেই রকম বিচিত্র ফুলে ফলে, ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, মানুষ থাকে চিরন্তন কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে, তাকেই আমরা বলে থাকি সাহিত্য। তিনি বলেছেন সাহিত্যের বিষয় মানব হৃদয় এবং মানবচরিত্র। ভাষার যে উপকরণে সৃষ্টি সম্পন্ন হয় তা হল চিত্র ও সঙ্গীত। চিত্র ভাবকে আকার দান করে। সঙ্গীত তাকে প্রাণময় ও জীবন্ত করে তোলে, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং প্রকৃতি ও মানব চরিত্রের মধ্যে নিজেকে সৃষ্টি করে চলেছেন। মানুষের মধ্যেও নিজেকে সৃষ্টি করার যে ব্যাকুলতা চিত্র ও সঙ্গীতের আশ্রয়ে তা ভাষাবদ্ধ হয়েই সাহিত্যে রূপ পায়। সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টার আনন্দ। মানবহৃদয় সেই আনন্দের প্রতিধ্বনি। এই আনন্দ স্রষ্টার হৃদয় থেকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। রবীনন্দ্রনাথ তাই মনে করেন, সাহিত্যে কখনো ব্যক্তিবিশেষের হতে পারে না, রচয়িতারও নয়, তা এক দৈববাণী।

উদ্ধৃতি

১. ''ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে; চিত্র এবং সংগীত''।
২. ''চিত্র এবং সংগীতেই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সংগীত প্রাণ।'' ''.....সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্র।''
৩. বলরাম দাসের একটি পদ উদ্ধৃত আছে প্রবন্ধটিতে - দেখিবারে আঁখি পাখি ধায়।

তথ্য ও সত্য

'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধটিতে (১৩৩১ ভাদ্র) রচিত হয়েছিল। পরে 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে তথ্য ও সত্যকে আমাদের মনের দুটি বিশিষ্ট উপাদান বলে গ্রহণ করেছেন। তথ্য অর্থাৎ তথ্য হল বাস্তবের সত্য রূপ আর এই তথ্য অবলম্বন করে হৃদয় যা প্রকাশ করে তা হল সত্য। সাহিত্যে স্রষ্টা সর্বদা তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে সত্যের স্বাদ দিয়ে চলেছে। তথ্য হল খন্ডিত, স্বতন্ত্র, একক - সত্যের মধ্য দিয়ে সে বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে। সাহিত্য ললিতকলার কাজই হল সীমার মধ্যে অসীমকে প্রকাশ করা 'আমি' শব্দে ব্যক্তিরূপটি স্পষ্ট, যা আমাতে বদ্ধ। এটি তথ্য মাত্র। যখন বলা হয় 'আমি মানুষ', তখন তথ্য থেকে অখন্ড সত্যে তার উত্তরণ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন - 'তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।'

সাহিত্যে তথ্যের সত্য উত্তরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় রস। কবি কবিতায় যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেকটি শব্দের আভিধানিক অর্থ আছে। সে অর্থ হল শব্দের তথ্যসীমা। সেই তথ্যসীমাকে অতিক্রমের জন্য কবি অসীমেকর সত্যে উত্তরণের জন্য নানা কৌশল ও ভঙ্গি সঞ্চার করে; এই প্রয়াসের মধ্যে নিহিত থাকে রসের দ্যোতনা।

১. 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে উল্লিখিত বিদ্যাপতির পদ -
''যব গোধূলি সময় বেলি ধ্বনি মন্দির মাঝে ভেলি,
নব জলধরে বিজুরিরেহা দ্বন্দ পসারি গেলি।''
২. এই প্রবন্ধে উল্লিখিত গোবিন্দদাসের পদ -
'' শরদ - চন্দ পবন মন্দ বিপিএ বহল কুসুমগন্ধ,
ফুল মল্লি মালতী যুথী মত্তমধুপ ভোরণী।''

৩. জ্ঞানদাসের পদ - পাথারে
"রূপের পাথরে আঁখি ডুবিয়া রহিল,
যৌবনের বনে মন পথ হারাইল।"
৪. কবিবল্লভের পদ -
"জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু নয়না তিরুপতি ভেল
লাখ লাখ যুগ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।"
৫. "রসবস্তুর এবং তথ্যবস্তুর এক ধর্ম এবং এক মূল্য নয়।
৬. "সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়।"
৭. ইংরেজ কবি কীটস একটি গ্রীক পূজাপাত্রকে উদ্দেশ্য করে কবিতা লিখেছিলেন। কীটস্ তাঁর কবিতায় নিখিল একের সঙ্গে গ্রীক পাত্রটির ঐক্যের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন - "Thou silent from, dos't tease us out of thought
As doth etoznity."
৮. "তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশি হচ্ছে প্রকাশ।"
৯. 'তথ্য ও সত্য' প্রবন্ধে একটি ছেলেভুলানো ছড়ার প্রসঙ্গ আছে -
"খোকা এল নায়ে লাল জুতুয়া পায়ে। পঙক্তি মনে পড়েছে কবির ।

১০. জ্ঞানদাসের দুটি পঙক্তি মনে পড়েছে কবির -
এক দুই গনইতে অন্ত নাহি পাই
রূপে গুণে রসে প্রেমে আরতি বাঢ়াই।

বাস্তব

রবীন্দ্রনাথের 'বাস্তব' প্রবন্ধটি 'সবুজপত্র' পত্রিকায় ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত হয়েছে। একদা রবীন্দ্রনাথের প্রতি অভিযোগ উঠেছিল। তাঁর সাহিত্যে বাস্তবতা নেই, তা জনসাধারণের উপযোগী নয় এবং তাঁর সাহিত্যের দ্বারা লোকশিক্ষা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ সমালোচকদের বাস্তবতাহীন সাহিত্যের প্রতি কটাক্ষের জবাবে 'বাস্তব' প্রবন্ধটি রচনা করেন।

সাহিত্যের বাস্তবতা বা তথ্যকে সত্য করে তোলা সাহিত্যের কাজ। সেই সত্য রসবস্তুর মাধ্যমে সংঘটিত হলে তবে তা সাহিত্যে পদবাচ্য হয়। সমালোচক মাত্রই রসিক নন। এই রস উপলব্ধির জন্য রসিকের প্রয়োজন, সমালোচকের নয়। রস বুদ্ধিগ্রাহ্য বস্তু নয়, তাই বুদ্ধি বা বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে এর বিচার চলে না। তাই সাহিত্যের বিচারের জন্য চায় রসিক। রবীন্দ্রনাথ তাই স্পষ্টতেই বলেন।

"দময়ন্তী যেমন সকল দেবতাকে ছাড়িয়া নলের গলায় মালা দিয়াছিলেন, তেমনি রসভারতী স্বয়ম্বর সভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রসিকের সন্ধান করিয়া থাকেন।"

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্য রচনার মধ্যে বাস্তবতা যেখানে উপস্থিত আছে, সমালোচকদের মতে তা 'গোরা' উপন্যাসে। গোরায় হিন্দুয়ানির ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তাই মনে হয়েছে ওটাই বাস্তবতার লক্ষণ। হিন্দুত্বের নিরিখেই কালিদাস কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রকে ভালো বলি, হিন্দু নারীর আদর্শ, স্বামী সম্পর্কে হিন্দুরমনীর মনোভাব হিন্দুশাস্ত্র সম্মত যা জাতির আত্মশ্লাঘার বিষয়। এই শাস্ত্রীয় বাস্তবতা শ্রদ্ধার যোগ্য। কিন্তু হিন্দুত্ব দিয়ে সাহিত্যে 'বাস্তব' আছে কি নেই তার বিচার বিশ্লেষণ চলে না। অপরদিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস্ শেলি, টেনিসন এঁদের সাহিত্যে হিন্দুত্ব নেই তাও তাদের সাহিত্য দেশ কাল, সমাজ, উত্তীর্ণ হয়ে আজও পাঠকের মনে বেঁচে আছে। ভিক্টোরীয় যুগের টেনিসন লোকধর্মের কবি ছিলেন। কিন্তু তাঁর কালের পর টেনিসন পাঠকের মন থেকে নির্বাসিত হয়েছেন। অপরদিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থর কবিতাটিতে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে একটি আনন্দময় আর্বিভাব দেখা যায় তা দেশ কাল উত্তীর্ণ। শেলিকে সমকাল অস্পৃশ্য অন্ত্যজের মতো তাঁর দেশ সেদিন ঘরে ঢুকতে দেয়নি। কীটস্‌কে মৃত্যুবাণ মেরেছিল। কিন্তু শেলী, কীটস্ , ওয়ার্ডসওয়ার্থরে গ্রহণযোগ্যতা দেশ কাল ছাপিয়ে বিশ্বব্যপী ছড়িয়ে পড়েছে। বাস্তবতা কখনো রসসাহিত্যের মাপকাঠি হতে পারে না।

কোনো দেশের সাহিত্য লোককে শিক্ষা দেবার জন্য রচিত হয়নি। সাধারন লোক নিজের প্রানের তাগিদে সাহিত্য পড়তে শিখেছে। ইস্কুল মাস্টারির ভার বহন করার জন্য সাহিত্য নয়। 'মেঘদূত' 'কুমারসম্ভব' 'রামায়ন' 'মহাভারত' সমস্ত গ্রন্থগুলি সমসাময়িক কালের মানুষেরা বুঝতে না পারলেও কালকের সাধারণ মানুষ হয়তো বুঝবে কবি সেইরকম আশা রাখেন। সৃষ্টি যেখানে শুধুমাত্র আনন্দ পাওয়ার জন্য তৈরী হয় সেখানে তানসেনের মতো গুণী ব্যক্তিরা মেঠো সুর তৈরী করতে পারেন না। তাই রবীন্দ্রনাথ বলছেন - ''সে আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, তাহা লোকহিতের এবং ইস্কুল মাস্টারির আদর্শ নহে। তাহা আনন্দময় সুতরাং অনির্বাচনীয়। কবি জানেন, যেটা তাহার কাছে এতই সত্য সেটা কাহারো কাছে মিথ্যা নহে''। রবীন্দ্রনাথের মতে, অনুভবে বা হৃদয়ে যে ভাব ও বিষয় সত্য, সাহিত্যে তাই বাস্তব রূপে সমাদৃত হবার যোগ্য।

সাহিত্যে নবত্ব

'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ শে আগস্ট প্লানসিউজ জাহাজে বসে লিখেছিলেন। প্রবন্ধটি পরে 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউরোপীয় অভিঘাতেই এই নবত্বের, সূচনা এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। ইংরেজি শিক্ষার গোড়াতেই আমরা যে সাহিত্যের পরিচয় পেয়েছি, তার মধ্যে বিশ্ব সাহিত্যের আদর্শ আছে। আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে বিদেশি সাহিত্যের বিষয় একাত্ম না হলেও বক্তব্য উপস্থাপনের রীতি ও আদর্শ সর্বকালীন ও সর্বজনীন। কল্লোলযুগের তরুণ লেখকেরা সেই আদর্শকে গ্রহন করে বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিতে চেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কল্লোলযুগের সাহিত্যরচনার মধ্যে দুটি প্রবনতা লক্ষ করেছেন, তা হল - ১) দারিদ্র্যের আস্ফালন এবং ২) লালসার অসংযম। এই ধরনের প্রবনতাকে তিনি বলেছেন 'রিয়ালিটির কারি পাউডার'। য়ুরোপীয় সাহিত্যের ওরিজিন্যালিটিকে নষ্ট করে সাবেকি মূল্যবোধ ও আদর্শকে বিকৃত করে ডাডায়িজম এর প্রতিষ্টা ঘটে। আধুনিক সাহিত্যে শিশিতে - সাজানো বাঁধা বুলি - অপটু লেখকদের সৃষ্টি। এদের মধ্যে রিয়ালিটির আস্ফালনকে রবীন্দ্রনাথ খুব বিপজ্জনক বলে মনে করছেন। নতুন সাহিত্যে ঝাঁজ বাড়াবার জন্য সবসময় ভাবুকতার কারি পাউডার যোগে কৃত্রিম - সস্তা সাহিত্যে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহবা পাওয়া যায়। তা আখেরে সস্তা ও সাহিত্যের স্বাস্থ্যহানি ঘটাচ্ছে। নব্য লেখকদের এই চিত্ত বিকারজনিত কারণে সাহিত্যিক কাপুরুষতা ফলাও করে প্রকাশ করেছে।

তরুণ লেখকেরা অনেকেই সাহিত্যে 'সহজিয়া' সাধন গ্রহন করেছেন। তারা বলতে চায় - 'আমরা কিছু মানি নে' - কারন অহংকার তারুন্যের বীরের ধর্ম অরণ্যের এই অহংকারকে রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধাও করেন। আবার নবীন লেখকেরা সাহসী পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে শক্তির প্রকাশ ঘটান। তাই 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গসাহিত্যে এই সাহসিক সৃষ্টি - উৎসাহের যুগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তথ্য

১) 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধটির রচনাকাল - প্লান্‌সিউজ জাহাজ, ২৩ আগস্ট - ১৯২৭।
২) হোলরের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্যরচনার যে আদর্শটা আছে যেহেতু তা সর্বভৌমিক এই জন্যেই সাহিত্যপ্রিয় বাঙালিও সেই গ্রীক কাব্য পড়ে তার রস পায়।
৩) শরৎ চাটুজ্জের গল্পটা বাঙালির, কিন্তু গল্পবলাটা একান্ত বাঙালির নয়, সেইজন্য তাঁর গল্প- সাহিত্যের জগন্নাথ ক্ষেত্রে জাত বিচারের কথা উঠতেই পারে না।
৪) বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন করে প্রকাশ করতে পারে।
৫) ভাষাটাকে বেঁকিয়ে - চুরিয়ে, অর্থের বিপর্যয় ঘটিয়ে, ভাবগুলোকে স্থানে - অস্থানে ডিগবাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের উৎকর্ষ। চরম সন্দেহ নেই, সেই চরমের নমুনা য়ুরোপীয় সাহিত্যের ডাডায়িজম।
৬) অপটু কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাবপূরন করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে, যে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য নিলজ্জতাকে বলে পৌরুষ।
৭) আধুনিক সাহিত্যে সেইরকম শিশিতে সাজানো বাঁধি বুলি আছে - অপুট লেখকদের পাকশালায় সেইগুলো হচ্ছে 'রিয়ালিটির কারি - পাউডার'।

আধুনিক কাব্য

আধুনিক কাব্য প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়, 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায়। পরে 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) গ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আধুনিককালের গন্ডীতে বাঁধতে চাননি । নদী সামনের পথে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সোজা চলে না। যখন সে বাঁক ফেরে, সেই বাঁকটাকেই বলা যায় 'মর্ডান'। এই আধুনিকতা সময় নিয়ে নয় মর্জি নিয়ে। অর্থাৎ আচার ভাঙা ব্যাক্তিগত মর্জি দিয়েই আধুনিকতার শুরু। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটসের মধ্যে তার পূর্ণ প্রকাশ।

জীবিকা জীবনের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। সময়ের গতিতে মানুষের মন বদলেছে। সচেতন প্রয়াসে সাবেকি মূল্যবোধ ও তার মোহ ভাঙবার আয়োজন চলেছে। উনিশ শতকীয় বিষয়ীকে ছাড়িয়ে, বিশ শতকে বিষয়ই প্রধান হয়ে উঠেছে। এজন্য পাউন্ড নন্দনতত্ত্বের আলোচনায় সুন্দরী মেয়ে ও সাড্রিন মাছকে 'কি সুন্দর' বলে একই ভাষায় ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। বিংশ শতকের সাহিত্যে মনোহারিত্বের পরিবর্তে মনোজয়িতা, লালিত্যের পরিবর্তে যথার্থতা একান্ত কাম্য হয়ে ওঠে। সাহিত্যে সুন্দর অসুন্দরের কোনো ভেদাভেদ রইল না।

রবীন্দ্রনাথ তাই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন ''আধুনিকতার যদি কোনো তত্ত্ব থাকে, যদি সেই তত্ত্বকে নৈব্যক্তিক আখ্যা দেওয়া যায়, তবে বলতেই হবে, বিশ্বের প্রতি এই উদ্ধত অবিশ্বাস ও কুৎসার দৃষ্টিও আকস্মিক বিপ্লবজনিত একটা ব্যক্তিগত চিত্তবিকার''। একেও রবীন্দ্রনাথ মোহ বলে জেনেছেন। বিশ্বকে নির্বিকার তদগতভাবে দেখার মধ্যে বিশুদ্ধ আনন্দ আছে। এই আনন্দের আস্বাদনই সাহিত্যের চরম অভিপ্রায়। একেই বলা যায় শাশ্বত আধুনিক।

তথ্য

১) প্রবন্ধটির প্রকাশকাল - বৈশাখ - ১৩৩৯
২) মডার্ন বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে কিছু লিখতে অনুরোধ করলে রবীন্দ্রনাথ 'আধুনিক কাব্য' প্রবন্ধটি লেখেন ।
৩) উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইংরেজি কাব্যে পরবর্তীকালে আচারের প্রাধান্য ব্যক্তির আত্মপ্রকাশের দিকে বাঁক ফিরিয়েছিল, তখনকার কালে সেটাই হল আধুনিকতা ।
৪) 'একজন কবি লিখেছেন I am the greatest laughter of all বলেছেন --- ''আমি সবার চেয়ে বড়ো হাসিয়ে, সূর্যের চেয়ে, অ্যাপলো দেবতার চেয়ে, Than the frog and Apollo - এটা হল ভাঙা কাঁচে'' এখানে ব্যাঙকে আনা হয়েছে জোর করে মোহ ভাঙবার জন্যে।
৫) 'তুমি সুন্দরী এবং তুমি বাসি'----- কবিতাটি লেখেন এমি লোয়েল ।
৬) এমি লোয়েল লাল চটিজুতোর দোকান নিয়ে একটি কবিতা লিখেছেন, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নৈব্যক্তিক, impersonal
৭) উনিশ শতাব্দীতে কাব্য ছিল বিষয়ীর আত্মতা আর বিশ শতাব্দীতে ছিল বিষয়ের আত্মতা।
৮) ''আর্টের কাজ মনোহারিতা নয়, মনোজয়িতা, তার লক্ষণ লালিত্য নয় যথার্থ্য''।
৯) ''কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর, কেউ কাজের, কেউ অকাজের, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব / সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেইরকম''।
১০) এলিয়েটের কাব্য এইরকম হালের কাব্য, ব্রিজেসের কাব্য তা নয়''।
১১) রবীন্দ্রনাথের মতে আধুনিকতা -- ''বিশ্বকে নির্বিকার তদগতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল বিশুদ্ধ, এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এটিই শাশ্বতভাবে আধুনিক''।
১২) সায়েন্সই হোক আর আর্টস হোক, নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ট বাহন, য়ুরোপে সায়েন্স তা পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায়নি।

মনুষ্য

রবীন্দ্রনাথের 'মনুষ্য' প্রবন্ধটি ১৩০০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যায় 'সাধনা প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'ডায়ারি শিরোনামে পরে 'মনুষ্য' নামে পঞ্চভূত (১৮৯৭) গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত হয়। পঞ্চভূতের অর্ন্তগত প্রবন্ধগুলিতে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সত্তাকে পাঁচটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে অভিহিত করেছেন। সত্তাপঞ্চকের কথোপকথন সূত্রে নিজে ভূতসভার সভাপতি ভূতনাথ রূপে আপন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। স্রোতস্বিনী সম্পর্কে ভূতনাথ বাবু যে মন্তব্য করেন সে বিষয়ে অভিযোগের সূত্র ধরে সাহিত্যে মনুষ্য চরিত্র কতখানি প্রতিফলিত হয় সে সম্পর্কে চরিত্রগুলির নিজস্ব অভিমত ফুটে ওঠে। বাস্তব চরিত্রের তথ্য ও তার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে সহিত্যের চরিত্র গড়ে ওঠে। সেই কল্পনার মধ্যে যদি ভালবাসার রঙ লাগে, তবে জীবের মধ্যে আমরা অনন্তকে অনুভব করি, তেমনি প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য সম্ভোগ। বৈষ্ণব ধর্মে প্রেম সম্পর্কের মধ্যে ঈশ্বরেক একান্ত আপনভাবে অনুভব করার কথা ব্যক্ত আছে। মানবীয় প্রেমের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে অনন্ত বা অসীমের উপলব্ধি ঘটে। মানুষের জীবনে যদি শুধু সারটুকুকে গ্রহন করে বাকিটুকুকে বিসর্জন দিই, তবে মানুষটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আমের যে সুন্দর গন্ধ ও সুরূপ আকার আছে, আমসত্তে তাঁর আভাসটুকুও মেলে না। মানুষের জীবনটাও তেমনি। মানুষের সুমহান অন্তরাত্মাকে কিছু চিন্তাশীল মানুষ গ্রহন করেন, কিন্তু সাধারন মানবসমাজ ভালোমন্দ মেশানো গোটা মানুষটাকে চায়, সমীর স্পষ্টতই বলে - ''আমি দার্শনিক তত্ত্ব নই, আমি ছাপার বহি নই। আমি তর্কের সুযুক্তি বা কুযুক্তি নই - আমার বন্ধুরা আমার আত্মীয়েরা আমাকে সর্বদা যাহা বলিয়া জানেন আমি তাহাই''। মানুষের মন ও চরিত্রের আকৃতিটাই সাহিত্যে স্টাইল বলে বিবেচিত। এই ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যের জন্য ভীষ্ম, দ্রোন। কৃষ্ণার্জুন প্রমুখ মহাকাব্যের নায়েকরা নব্যযুগের কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই আধুনিক সাহিত্যে অজ্ঞাতনামা দীপ্তিহীন মানুষেরাও তাদের মনুষ্যত্ব নিয়ে সাহিত্যকাশো ভিড় জমিয়েছেন।

তথ্য

১) স্রোতস্বিনীর মতে 'সাহিত্যে বলবার বিষয়টা বেশি, না বলিবার ভঙ্গিটা বেশি'- এই ভঙ্গিই হলো স্টাইল।
২) বঙ্গসাহিত্যে বা সাহিত্যে দেখা গেছে, 'যথার্থ মানুষগুলো উপন্যাস, নাটক এবং মহাকাশে আশ্রয় লইয়াছে।'
৩) প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বাতন্ত্রতা আছে তবে তা দেখার চোখ সকলের নেই।
৪) বৈষ্ণবকাব্য ও তত্ত্বের অনুষঙ্গে ভূতনাথবাবুর মন্তব্য খুবই যথার্থ -''যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা।''

নরনারী

রবীন্দ্রনাথের 'নরনারী' প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাধনা প্রত্রিকায় চৈত্র ১২৯৯ সালে। পরবর্তীকালে চৈত্র ১৩৮২ সালে কিছু সংযোজন করেছিলেন। প্রবন্ধটি 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭) গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের নরনারী প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হল সমাজ জীবনের নর নারী ও পুরুষের ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা। ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনায় সমীর সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, ইংরেজি সাহিত্যের নায়ক নায়িকারা সামঞ্জস্যপূর্ণ, কেউ কাউকে অতিক্রম করে যায়নি। বাংলা সাহিত্যে নায়িকারই প্রাধান্য। পুরুষেরা তুলনায় ম্লান। প্রবন্ধে পঞ্চভূত অর্থাৎ সমীর, ক্ষিতি দীপ্তি, স্রোতস্বিনী, ব্যোম এবং কথক নারী পুরুষের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের মন্তব্য প্রকাশ করেছে। ক্ষিতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে মানসপ্রধান বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু দীপ্তি এর প্রতিবাদ করে বলে যে, নারী কার্য জগতেও পুরুষের তুলনায় কম উপরে নয়। দুর্গেশনন্দিনীতে বিমলা, দেবী চৌধুরানীতে প্রফুল্ল কর্মজগতেও কর্তৃত্ব ফলিয়েছেন। আমদের দেশের নারীদের কর্মের মধ্যে কোনো বিভাজন করা যায় না। তবে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের কার্যের পরিসর সংকীর্ণ। স্বামীসন্তান আত্মীয় পরিজনের সন্তুষ্টি বিধান করে নারী পরিতৃপ্ত। বৃহত্তর জগতে নারীর কর্মফল প্রত্যক্ষগোচর না হলেও তা অন্তঃসলিলার মতো ক্রিয়াশীল। ক্ষিতি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, নারী স্বভাবপটুত্বের গুনে দৈব অভ্যাসের অনুগামী রূপে পুরুষের উপর কর্তৃত্ব করে চলে। প্রকৃতিই নারীকে আদুরে করে গড়েছে, হৃদয়ালুতা গুণেই সে পুরুষকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কর্মে আর হৃদয়রাজ্যে মেয়েরা সর্বেসর্বা হলেও সমগ্র নারী জাতির কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি ও হৃদয় দিয়ে মানুষকে ভালবাসতে শিখছে, তাই যুক্তি বুদ্ধির বিশ্লেষনে সব কিছু যাচাই না করার জন্য নারী সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পরেনি।

পল্লীপ্রকৃতি - ১

শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত প্রবন্ধ ভাষণ ও পত্রাদির সংকলন হল 'পল্লীপ্রকৃতি'। পল্লীপ্রকৃতি প্রবন্ধটি 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের 'বৈশাখ' সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে তেইশে (২৩) মাঘ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় থেকে 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত 'পল্লীপ্রকৃতির' প্রবন্ধসূচী -

পল্লীর উন্নতি	**প্রবাসী**	**বৈশাখ**	**১৩২২**
ভূমিলক্ষী শ্রীনিকেতন	ভূমিলক্ষ্মী প্রবাসী বিচিত্রা	আশ্বিন	১৩২৫
পল্লীপ্রকৃতি	প্রবাসী প্রবাসী প্রবাসী বিচিত্রা	জ্যৈষ্ঠ	১৩৩৪
দেশের কাজ		বৈশাখ	১৩৩৫
উপেক্ষিতা	প্রবাসী প্রবাসী	চৈত্র	১৩৩৮
পল্লী অরণ্য দেবতা		চৈত্র	১৩৪০
অভিভাষন		কার্তিক	১৩৪৫
(শ্রীনিকেতন নামে মুদ্রিত) শ্রীনিকেতনের		পৌষ	১৩৪৫
ইতিহাস ও		ভাদ্র	
আদর্শ হলকর্ষণ		আশ্বিন	
পল্লীসেবা		ফাল্গুন	১৩৪৬
			১৩৪৬
			১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ 'পল্লীর উন্নতি' প্রবন্ধে বলেছেন, পল্লীবাসীই পল্লীর উন্নতির প্রধান অন্তরায়। বাড়ীর মেয়েরা দুতিন মাইল হেঁটে জল আনতে যাবে। তাদের কুয়ো খোঁড়ার পরামর্শ দিলে তাদের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল - 'মাছের তেলে মাছ ভাজা'। কিন্তু গ্রামীণ মহিলাদের বিশ্বাস - কুয়ো যে বাঁধিয়ে দেবে তার পুন্য হবে। তারা কোনভাবে ঠকতে চাইছে না। বছরের পর বছর দুই - তিন মাইল দূর থেকে জল আনছে। নিজেদের দারিদ্র্য তাদের অহংকার। কিন্তু পরলৌকিক বিষয় বুদ্ধিকে উন্নতির ছাপিয়ে যখন বাস্তব বিষয়বুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠল, তখন যারা পল্লীর উন্নতি করতে পারতো, তারা ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য অর্থ, জ্ঞান, বিদ্যা চিকিৎসার লোভে শহরে শহরে ছড়িয়ে পড়ল। পল্লী রয়ে গেল সেই অন্ধকারে। রবীন্দ্রনাথ পল্লীর একটি গ্রামকে মডেল রূপে নির্বাচন করে তার রাস্তা, শিক্ষা, চিকিৎসা ব্যবসা, সাহিত্য, শিল্পচর্চা সঠিকভাবে উন্নতি বিধান করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছেন। 'ভূমিলক্ষ্মী' একটি কৃষিপত্রিকা। এই পত্রিকার মাধ্যমে কৃষি বিকাশের পাঠ দান করে লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর মেল বন্ধন ঘটানোর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ হলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল। দেশের চিত্তক্ষেত্রও এতে সমৃদ্ধ হবে।

'শ্রীনিকেতন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের তুলনা করেছেন।

'পল্লীপ্রকৃতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন একদা গ্রামের মানুষেরা মিলিত হয়েছিল সকলে মিলে সঞ্চয়, সংগ্রহ ও ভোগ করবার জন্য। বিজ্ঞান মানুষকে যে মহাশক্তি দিয়েছে মানুষ যেন তা মঙ্গলের কাজে প্রয়োগ করে। 'দেশের কাজ' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন রিপু তাড়িত হয়ে কোন কাজ করা সম্ভব নয়। দেশের মতো বৃহত্তর ক্ষেত্রের কাজ তো একেবারেই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ জাতিকে সাবধান করে বেলেছেন ''যারা নিজেদের রক্ষ করতে পারে না, দেবতা তাদের সহায়তা করেন না।'' সুতরাং, আত্মরক্ষায় ব্রত দেশের মানুষকে গ্রহন করতেই হবে। 'উপেক্ষিতা পল্লী' প্রবন্ধে বলেছেন সব কিছু কাজের মধ্যে পল্লীতে যেন সাম্য অবস্থা বর্তমান থাকে। 'অরণ্যদেবতা' প্রবন্ধে মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করেছে। তার ফলে নেমে এসেছে বিভিন্ন

প্রকৃতিক বিপর্যয়। তাই অরন্যসম্পদ রক্ষা করা আজ মানুষের শুধু কর্তব্য নয়, অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

'অভিভাষণ' প্রবন্ধটি শ্রীনিকেতনের শিল্পভান্ডার উদ্‌বোধন প্রসঙ্গে রচনা করেছিলেন। পল্লী বাংলায় রবীন্দ্রনাথ তাই কর্মমন্দিরের পাশাপাশি শিল্পমন্দির গড়ে তুলে জীবনের পূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছেন।

'শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ পদ্মাপারের পল্লীজীবনের অভিজ্ঞতা ও তার বির্বতনের সূত্রে শ্রীনিকেতনের পল্লীবাংলার পরিচয় তুলে ধরেছেন।

'হলকর্ষণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একদা অরণ্যচারী পশুশিকারী মানুষ পশুকেই বশ মানিয়ে কৃষিসভ্যতা গড়ে তুলেছে। কৃষির মধ্য দিয়েই প্রকৃতির সঙ্গে গড়েছে হার্দ্রিক সম্পর্ক।

'পল্লীসেবা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বিলেত বাসের অভিজ্ঞতায় গ্রাম ও শহরের সুযোগ সুবিধার কথা ব্যক্ত করেছেন।

teachinns
Text with Technology

Sub Unit - 6

জাপান যাত্রী

১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের জাপান যাত্রা ও বাস কালে জাপানযাত্রীর নিবন্ধগুলি 'জাপানযাত্রীর পত্র' 'জাপানের পত্র', জাপানের কথা ইত্যাদি নামে 'সবুজ পত্র' পত্রিকায় (বৈশাখ ১৩২৩ - বৈশাখ ১৩২৪) প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের ৬ই শ্রাবন 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেছিলেন। এ. ই. সি. এফ অ্যান্ডজ, উইলি পিয়র্সন এবং শ্রী মুকুলচন্দ্র দে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাহাজ থেকে ও জাপানে বসবাসকালে যে বৃত্তান্ত চিঠিতে লিখে পাঠান, সেই ১৫টি চিঠি রবীন্দ্রনাথের 'জাপানযাত্রী' ভ্রমণগ্রন্থের মূলবিষয়। রবীন্দ্রনাথ তোসামারু জাহাজে চড়ে বসেন জাপান যাত্রার উদ্দেশ্যে ১৯১২ সালের ১লা মে। রেঙ্গুন সিঙ্গাপুর হয়ে ২৯শে মে রবীন্দ্রনাথ সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের প্রধান বন্দর কোবেতে পৌছান। কবিকে অভ্যর্থনা জানাতে উপস্থিত হন য়োকায়ামা টাইকান ও কাটসুদা শেকিন নামে কবির পূর্ব পরিচিত দুই চিত্রশিল্পী, পরিব্রাজক কাওয়াগুচি এক্কাই ছাড়াও জাপানের প্রবাসী ভারতীয়রা। তিনি প্রবাসী ভারতীয় বনিক মোররজীর গৃহে আতিথ্য গ্রহন করেন।

কোবেল ওরিয়েন্টাল ক্লাবে ৩১ শে মে প্রবাসী ভারতীয়রা রবীন্দ্রনাথকে প্রথম সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ১৩ জুন কানেজি বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী কাউন্ট ওকুমা, শিক্ষামন্ত্রী ড তাকাদা, বৌদ্ধ জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান হিকি প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ইংরেজি ভাষা, জাপানী ও ভারতীয় উভয়েরই বিদেশি ভাষা হওয়ায় রবীন্দ্রনাথ সেই অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষাতেই তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

রবীন্দ্রনাথ রেঙ্গুনে পৌছে বর্মী মেয়েদের দেখে বোলপুরের সাঁওতাল রমনীদের কথা স্মরন করেছেন। ব্রহ্মদেশের নারীরা কঠিন শ্রমের মধ্য দিয়ে মুক্তির স্বাদ পায়। সিঙ্গাপুরে এক জাপানি মহিলার সান্নিধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথ জেনেছেন, নারী পুরুষের শুধু প্রেরণাদাত্রী নয়, কর্মসঙ্গিনী রূপেও কত সফল জুতে পারে, এই মহিলা তার উদাহরন। তার আইন ব্যবসায়ী স্বামী জাপানে পসার জমাতে ব্যর্থ হলে যৌথ উদ্যোগে তারা সিঙ্গাপুরে এসে ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসাক্ষেত্রে যে প্রানের প্রাচুর্য আছে, কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ, পটুতা, পরিশ্রম এবং মানুষের সঙ্গে ব্যবহারই যে সমস্ত কাজে সাফল্যের চাবিকাঠি, সে কাজে নারী স্বয়ংসিদ্ধা, তা তিনি অনুভব করেন।

teachinns Text with Technology

জাপান শিল্পীর দেশ। আতিথেয়তা ও আন্তরিকতা অনন্য। নৈঃশব্দ ও নিস্তব্ধতার সম্মোহনে আমন্ত্রিতের মনকে তারা সম্মোহিত করে তোলে। তারপর নমস্কারের দ্বারা গৃহকর্তা আমন্ত্রিতকে অভ্যর্থনা জানান। জাপানি ঘর আসবাব শূন্য। দেওয়ালে থাকে একটি মাত্র ছবি। বহু ছবির উপস্থাপনায় তারা অতিথির চিত্তকে তারা বিচলিত করে না। জাপানি শিল্প জাপানিদের জীবনের মতোই অবকাশ ও বিরলতার উপযোগিতাকে গভীরভাবে আয়ত্ত করেছে।

জাপান ঠান্ডা মাথার দেশ। জাপানিরা প্রয়োজনের বাইরে কথা বলে না। সহিষ্ণুতাই তাদের নিজস্ব জাতীয় সাধনা। রবীন্দ্রনাথ 'জাপান যাত্রীঞ্চ প্রবন্ধে বলেছেন - ''লোকে বলে জাপানের ছেলেরা যুদ্ধে কাঁদে না। আমি এ পর্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখিনি''। সহিষ্ণুতা জাপানিদের অশৈশব সাধনা। মানবিক মূল্যবোধের প্রতি দায়বদ্ধতাই তাদের অমন সহিষ্ণু করে তুলেছে।
জাপানি সাহিত্য জাপানি জীবনেরই দর্পন। শান্ত, সংযম, সহিষ্ণু জীবনের ছাপ জাপানি সাহিত্যে মেলে। রবীন্দ্রনাথ আবাক বিস্ময়ে লিখেছেন — ''তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক উভয়ের পক্ষে যথেষ্ট।'' হৃদয় নিঙড়ানো ব্যথা বেদনায় জেগে থেকে এরা প্রানের অপচয় করে না। জীবনের উচ্ছলতায় গান গেয়ে ওঠে না। জাপানিদের জীবন সরোবরের মতো শান্ত, নিস্তব্ধ, গভীর-গম্ভীর। রবীন্দ্রনাথ জাপানি কবিতার একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বলেছেন -

'পুরোনো পুকুর ব্যাঙের লাফ
জলের শব্দ'।

আমাদের সাহিত্যের বিচারে একে কবিতা বলতে দ্বিধা হতে পারে। জাপানিদের এটাই কবিতা। এ তো ভাষায় আঁকা ছবি। জাপানি পাঠকের মন আসলে চোখ ভরা।

জাপানিরা দেহ ও মনকে সংযত করে নিরাসক্ত মনে সৌন্দর্যকে আপন অন্তরে গ্রহণ করে। সৌন্দর্যরে গভীরতায় জাপানিরা আত্মসমাহিত হতে পারে। জাপানি নারী পুরুষের মধ্যে তাই লজ্জা সংকোচের কোন আবিলতা নেই। জাপানিদের দৃষ্টি এতটাই মোহমুক্ত আবিলতাহীন নারী পুরুষ বিবস্ত্র হয়ে একত্রে স্নান করতে কোনো বাধা আনুভব করে না। জাপানি ছবিতে উলঙ্গ নারীমূর্তির আবেদন নেই। স্বল্পবাস পরিহিতা নারী নিজেকে বিজ্ঞাপিত করে না। কি কঠোর সাধনা ও শক্তি বলে জাপান এই নিরাসক্ত দৃষ্টি আয়ত্ত করেছে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেছেন ভারতবর্ষ যদি জাপানকে গ্রহন করার উদারতা
দেখাতে পারতো, তাহলে আমাদের অনেক বিশ্রীতা, অশুচিতা ও অসংযম দৃঢ় হতে পারত। 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অকপটভাবে 'দ্রষ্ট' আমির উপলব্ধিকে মেলে ধরেছেন। জাপানি সভ্যতা, সংস্কৃতির পরিচয় দানের পাশাপাশি 'আমি'র মিলনজাত রসের উপলব্ধিই ভ্রমন সাহিত্যের সামগ্রী। সমুদ্র ঝড়ের বর্ণনায় জল বাতাসের মাতামাতিকে বাংলা, অন্তস্থ বর্ণের দাপাদাপি তথা চন্ডী পাঠের উপমাচিত্রে নিসর্গের মধ্যে প্রাণ প্রাচুর্যকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন আমাদের সঙ্গে য়ুরোপের কোথাও মিল থাক না থাক, এক জায়গায় মিল আছে। আমরা 'অন্তরতর' মানুষকে মানি। বাইরের মানুষের থেকে বেশি মানি। এই অন্তরমহলে মানুষের যে মিলন সেই মিলনই সত্য মিলন, এই মিলনের দ্বার উদ্‌ঘাটনের কাজে বাঙালির আহ্বান আছে, তার চিহ্ন অনেকদিন থেকে দেখা যাচ্ছে।

তথ্য

১. জাপান যাত্রী, প্রবন্ধটির পরিচ্ছেদ সংখ্যা -১৫
২. জাপানযাত্রী প্রবন্ধটি উৎসর্গ করা হয়েছে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে।
৩. জাপানযাত্রী গ্রন্থটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হয় শ্রাবন ১৩২৬ বঙ্গাব্দে বা ১৯১৯ সালে ।
৫. পৃথিবীতে সবচেয়ে বড়ো রহস্য-দেখবার বস্তুটি নয়, যে দেখে সেই মানুষটি।
৬. রুশ জাপান যুদ্ধে জয়লাভের পর রবীন্দ্রনাথ জাপানের চরিএ বল ও বীর্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে জাপানী ছন্দে ৩টি কবিতা লেখেন। এই কবিতা তিনটি আষাঢ় ১৩১২ বঙ্গাব্দে ভান্ডার প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
৭. কবিতা তিনটি যথাক্রমে সেদোকা ছন্দ, চোকা ছন্দে, ও ইমায়ো ছন্দে লেখা।
৮. রবীন্দ্রনাথ জাপান যাত্রার আগে, যাত্রার পরিকল্পনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমথ চৌধুরী ও মীরা দেবীকে চিঠি লেখেন।
৯. ১৯৬১ সালে জাপান যাত্রী প্রবন্ধের ইংরেজি তর্জমা করেন শকুন্তলা রাওশাস্ত্রী। এই তর্জমা প্রকাশিত হয়েছে নিউইয়র্ক ইস্ট ওয়েষ্ট ইনস্টিটিউট থেকে - A Visit to Japan, Mrs Shakuntala Rao Sastri, Ed Walter Donald King.
১০. আচারকে শক্ত করে তুললে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়।
১১. রবীন্দ্রনাথের মতে, বাণিজ্য মানুষকে প্রকাশ করেনা, মানুষকে প্রচ্ছন্ন করে।
১২. রমনীর লাবণ্য যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী - রেঙ্গুনে মেয়েদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।
১৩ 'মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা'-- উদ্ধৃতিটি রয়েছে সপ্তম পরিচ্ছেদ ।
১৪. 'Book of Tea' বইটি ওকাকুরার রচনা।
১৫. বিদায় মাত্রেরই একটা ব্যথা আছে; সে ব্যথাটার প্রধান কারন এই, জীবনে যা কিছুকে সবচেয়ে নির্দ্দিষ্ট করে পাওয়া গেছে তাকে অনির্দ্দিষ্টের আড়ালে সমর্পণ করে যাওয়া''।
১৬. কবি কীটস বলেছেন, 'সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ সত্যের বাধা মুক্ত সুসম্পর্নতাতেই সৌন্দর্য। সত্য মুক্তি লাভ করলেই আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্নতাই সৌন্দর্য'।
১৭. রবীন্দ্রনাথের শিল্পীবন্ধু টাইকানের বাড়ি টোকিওতে।
১৮. 'অল্প করে না দেখলে পূর্ণ পরিমানে দেখা হয় না'।
১৯. ''ছবি জিনিসটা হচ্ছে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। -- রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। ---কবিতার উপকরন হচ্ছে ভাষা''।
২০. প্রবন্ধের কথা যেখানে থামে সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানে কথা যেখানে থামে সেখানে সুরে ভরাট। গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে।
২১. ''ধ্যানের যুগ, সংযমের সাধনা, সমস্ত পৃথিবী থেকেই আজ তিরস্কৃত হচ্ছে''।

Sub Unit - 7
জীবনস্মৃতি (১৯১২)

'জীবনস্মৃতি' প্রবাসী পত্রিকায় ভাদ্র ১৩১৮ সাল থেকে শ্রাবন ১৩১৯ সালের শ্রাবন পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত চব্বিশটি চিত্রে শোভিত হয়ে 'জীবনস্মৃতি' র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'জীবনস্মৃতি' (১৯১২) 'ছেলেবেলা' (১৯৪০) ও 'আত্মপরিচয়' (১৯৪৩) রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়মূলক তিনটি প্রবন্ধ গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যে আত্মকাহিনী হিসেবে 'জীবনস্মৃতি' স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনস্বীকার্য। আত্মপ্রসঙ্গ অবলম্বনে করে এইরূপ অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি রবীন্দ্র পূর্ব বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় না। শুধু আত্মজীবনী বলে নয় সাহিত্য শিল্পরূপেও জীবনস্মৃতি অনুপম রচনা। জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটি পড়বার সময় আমরা যেন সেকালের গন্ধ দৃশ্য স্পর্শের স্বাদ পেতে থাকি। বাংলা সাহিত্যে এক বিচিত্র অভিনব আত্মজীবনী। জীবনস্মৃতি গ্রন্থের সূচনাতে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য থেকে এর স্বাতন্ত্র্য ও স্বরূপ রহস্য উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি-ভাষণের সূচনায় লিখেছেন -

''জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে - তাহা কোনো এক অদৃশ্য চিত্রকরে স্বহস্তের রচনা। তাহাতে নানা জায়গায় যে নানা রং পড়িয়াছে তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে, সে রং তাহার নিজের ভান্ডারের, সে রং তাহাকে নিজের রসে গুলিয়া লইতে হইয়াছে ।'' এ জীবন অবশ্য ব্যক্তিজীবন নয়, কবিজীবন। 'জীবনস্মৃতিঞ্চ গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের প্রাথমিক পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভবতোষ দত্ত 'জীবনস্মৃতি' প্রবন্ধে এই মর্মে লিখেছেন যে ---- 'জীবনস্মৃতি শুধুই নিঃসঙ্গ কবিকাহিনী নয়,'' ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাঙালির সংস্কৃতির পটভূমিতে 'জীবনস্মৃতি' একটি কবি মানসের উৎকর্ষের ইতিহাস।''

জীবনস্মৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবনের কোন আনুপার্বিক ইতিহাস বর্ণিত হয়নি। ভৃত্যের শাসনাধীন বাল্যজীবন, বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার উপযোগী আয়োজন, পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রভাব, বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে বিস্ময়বিহলতা, বৌ ঠাকুরানীর স্নেহনির্ঝর ধারায় অভিষিক্ত শৈশবের সোনালী মুহূর্ত, স্বাদেশিকতার মোহময় এক গভীর উদ্বেল উত্তেজনা, বর্ষা ও শরতের অনন্ত অসীম মেঘালোকে কবিমনের নিরুদ্দেশ যাত্রা প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের শৈশবের বিচিত্র রসমধুর চিত্র, অনুপম রঙে ও রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আত্মপরিচয়মুখর 'জীবনস্মৃতি'র একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ কাহিনীর সর্বত্র লেখকের নিরাষক্ত দৃষ্টি ও সচেতন আত্মসংযম বর্তমান। 'জীবনস্মৃতি'র মুখ্য অংশই কবির শৈশবের বিচিত্র স্মৃতিকথায় পূর্ণ। বিবিধ প্রানবন্ত চিত্রের মধ্য দিয়ে শৈশবকালীন আমিত্বের স্বরূপ বা প্রকৃতি অপূর্ব সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অতীতকালের বিচিত্র ঘটনা কোথাও পরিহাস রসিকতায় কৌতুক মুখর কোথাও বা করুনর সে বেদনাবিধুর হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবন ও কবিমানস ক্ষেত্র যে সকল বিশিষ্ট মনীষী ও আত্মীয় পরিজনের প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল তাদের চরিত্র চিত্রও 'জীবনস্মৃতি'তে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। কাদম্বরী দেবী (অর্থাৎ বৌঠান) মিস আন্না, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এদের প্রভাব রবীন্দ্র শৈশব জীবনে খুব সর্বাপেক্ষা গভীর ছিল। ঋতুর আর্বতনে বিশ্বপ্রকৃতির যে মোহময় বিচিত্র লীলাভিসার ও তার রূপময় অভিব্যক্তি তা 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের অনিন্দ্য চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে সুপরিস্ফুট আছে। স্মৃতি-চিত্র প্রধান জীবনস্মৃতি বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের একক ও অনন্য সাধারন সৃষ্টি। বিশ্বজননী সাহিত্যে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। রবীন্দ্রনাথের আড়ম্বরবর্জিত অনবদ্য সুমধুর ভাষা জীবস্মৃতির এক দুর্লভ ঐশ্বর্য। অপরূপ রচনারীতির অনুকরনীয় কৌশলে ও ভাষানৈপুণ্যে জীবনস্মৃতি রবীন্দ্র প্রতিভার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

তথ্য

১. জীবনস্মৃতির রচনা সংখ্যা - ৪৫ যথাক্রমে সূচনা শিক্ষারম্ভ, ঘর ও বাহির , ভৃত্যরাজকতন্ত্র, নর্মাল স্কুল, কবিতারচনারম্ভ নানা বিদ্যার আয়োজন, বাহিরে যাত্রা, কাব্যরচনাচর্চা, শ্রীকণ্ঠবাবু, বাংলা শিক্ষার অবসান, পিতৃদেব, হিমালয় যাত্রা, প্রত্যাবর্তন ঘরের পড়া, বাড়ির আবহাওয়া, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, গীতচর্চা, সাহিত্যের সঙ্গী, রচনাপ্রকাশ, ভানুসিংহের কবিতা, স্বাদেশিকতা, ভারতী, আমেদাবাদ, বিলাতি সংগীত, বাল্মিকী প্রতিভা, সন্ধ্যাসংগীত, গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ, গঙ্গাতীর, প্রিয়বাবু, প্রভাত সংগীত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, করোয়ার, প্রকৃতির প্রতিশোধ, ছবি ও গান, বালক, বঙ্কিমচন্দ্র, জাহাজের খোল, মৃত্যুশোক, বর্ষা ও শরৎ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, কড়ি ও কোমল।

২. 'জীবনস্মৃতি'র প্রচ্ছদে ছিল নন্দলাল বসুর আকাঁ পদ্মফুল পাপড়ি খসার ছবি। এই ছবিটি 'ছিন্নপত্র'র প্রচ্ছদেও মুদ্রিত হয়। প্রচ্ছদসহ 'জীবনস্মৃতিঞ্চর মোট ছবির সংখ্যা ২৫।

৩. আশ্বিন ১৩১৯ (বুধবার ৮ সেপ্টেম্বর ১৯১২) লন্ডন থেকে রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে জীবনস্মৃতির ছবিগুলি সম্পর্কে লিখেছেন - ''জীবনস্মৃতিতে'' গগনের ছবিগুলি ভারি চমৎকার হয়েছে। এরা (ইয়েটস, রাথেনস্টাইন) প্রমুখ বিদেশি বন্ধুরা সেগুলোর খুব প্রশংসা করেছেন ।

৪. 'জীবনস্মৃতি'র প্রচ্ছদে ছিল নন্দলাল বসুর আঁকা পদ্মফুল পাপড়ি খসার ছবি। এই ছবিটি 'ছিন্নপত্র'র প্রচ্ছদেও মুদ্রিত হয়। প্রচ্ছদসহ 'জীবনস্মৃতিঞ্চর মোট ছবির সংখ্যা ২৫।

৫. জীবনস্মৃতির ইংরেজি তর্জমা করেন কবির ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১৬ সালে 'The ModernRelience' পত্রিকায় জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'My Reminiscences' নামে প্রকাশিত হতে থাকে।

৬. ''স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়োকে ছোটো করে, ছোটোকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না। বস্তুত তাহার কাজই ছবি আকাঁ, ইতিহাস লেখা নয়।'' (সূচনা অংশ)

৭. ''জীবনের স্মৃতি জীবনের ইতিহাস নহে তাহা কোন এক অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা।'' (সূচনা)

৮. ''সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে পাতা নড়ে'। আমার জীবনের এটিই আদি কবির প্রথম কবিতা।'' (শিক্ষারম্ভ)

৯. ''আমাদের একটি অনেক কালের খাজাঞ্চি ছিল, কৈলাস মুখুজ্যে তাহার নাম। সে আমাদের ঘরের আত্মীয়েরই মতো।'' (শিক্ষারম্ভ)

১০. ''শিশুকালের সাহিত্যের রসভোগের এই দুটো স্মৃতি এখনো জাগিয়া আছে - আর মনে পড়ে 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, নদেয় এল বান।' এ ছড়াটা যেন শৈশবের মেঘদূত।'' (শিক্ষারম্ভ)

১১.''চাকরদের মহলে যে সকল বই প্রচলিত ছিল তাহা লইয়া আমার সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত হয়। তাহার মধ্যে চাণক্যশ্লোকের বাংলা অনুবাদ ও কৃত্তিবাস রামায়নই প্রধান।'' (শিক্ষারম্ভ)

১২. 'সেদিকে বন্ধন যতই কঠিন থাক্ , অনাদর একটা মস্ত স্বাধীনতা - সেই স্বাধীনতায় আমাদের মন মুক্ত ছিল। খাওয়ানো পরানো সাজানো গোছানোর দ্বারা আমাদের চিত্তকে চারিদিক হইতে একেবারে ঠাসিয়া ধর হয় নাই। (ঘর ও বাহির)

১৩. ''বয়স দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনোদিন কোনো কারনেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল। ইহাতে কোনোদিন অদৃষ্টকে দোষ দিই নাই।'' (ঘর ও বাহির

১৪. ''পুষ্করিণী নির্জন ইহয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। ----- এই বটকেই উদ্দেশ্য করিয়া একদিন লিখিয়াছিলাম -

''নিশিদিশি দাঁড়িয়ে আছে মাথায় লয়ে জট,
ছোটো ছেলেটি মনে কি পড়ে, ওগো প্রাচীন বট।''

১৫. ''বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার জানালার নানা ফাঁক ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত'' (ঘর ও বাহির)

১৬. ''সংসারের ধর্মই এই বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা অর্থাৎ ছোটো যে সেই মারে, বড়ো যে সেই মার খায় - শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।'' (ভৃত্যরাজক তন্ত্র)

১৭. ''কেবল একটা লাইন মনে পড়িতেছে - কলোকী পুলোকী সিংগিল মেলালিং'' (নর্মাল স্কুল)

১৮. ''যাহা কঠিন তাহা কঠিনই যাহা দুঃসাধ্যই, ইহাতে কিছু অসুবিধা আছে বটে কিন্তু সহজ করিবার চেষ্টা করিলেও অসুবিধা আরো সাতগুন বাড়িয়া উঠে।'' (নর্মাল স্কুল)

১৯. ''চারুপাঠ, বস্তুবিচার, প্রানিবৃত্তান্ত হইতে আরম্ভ ইহার কাছে পড়া '' (নানা বিদ্যার আয়োজন)

২০. ''কড়ি-বরগা দেয়ালের জঠরের মধ্য হিতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম'' (বাহিরে যাত্রা)

২১. ''এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া করা, সংকুচিত একটুখানি খিড়কির বাগানের ঘোমটা পরা সৌন্দর্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্মুখের উদার গঙ্গাতীরের সঙ্গে এর কতই তফাত এ যেন ঘরের বধু।'' (বাহিরে যাত্রা)

২২. প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবা মাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইমাল''। (বাহিরে যাত্রা)

২৩. ''সেই নীল খাতাটি ক্রমেই বাঁকা বাঁকা লাইনে ও সরু-মোটা অক্ষরে কীটের বাসার মতো ভরিয়া উঠিতে চলিল।'' (কাব্যরচনা চর্চা)

২৪. ''ঝরণার ধারা যেমন একটুকরা নুড়ি পাইলেও তাহাকে ঘিরিয়া নাচিয়া মাত করিয়া দেয়, তিনিও তেমনি যে - কোন একটা উপলক্ষ পাইলেই আপন উল্লাসে উদ্‌বেল হইয়া উঠিতেন''। (শ্রীকণ্ঠ বাবু)

২৫. ''শিক্ষা জিনিসটা যথা সম্ভব তাহার ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবা মাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরাবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে - তাহাতে তাহার জারক রসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়''। (বাংলা শিক্ষার অবসান)

২৬. ‘অপরাধ করা ছাত্রদের এক ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম’ (বাংলা শিক্ষার অবসান)

২৭. ‘‘শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা - বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া’ (পিতৃদেব)

২৮. ‘‘জগতে না - বুঝিয়া পাইবার রাস্তায় সকল সময়েই সকলের চেয়ে বড়ো রাস্তা। সেই রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া গেলে সংসারের পাড়ায় হাটবাজার বন্ধ হয় না বটে কিন্তু সমুদ্রের ধারে যাইবার উপায় আর থাকে নে, পর্বতের শিখরে চড়াও অসম্ভব হইয়া উঠে।’’ (পিতৃদেব)

২৯. ‘‘অন্তরের অন্ত:পুরে যে কাজ - চলিতেছে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সকল সময়ে তাহার খবর আসিয়া পৌছায় না’’। (পিতৃদেব)

৩০ ‘চাই’ এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়’’। (হিমালয় যাত্রা)

teachinns
Text with Technology